ইসলামী নেতৃত্ব

এ কে এম নাজির আহমদ

প্রকাশনায়
আহ্সান পাবলিকেশন
❒ ১৯১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩৫৩১২৭
❒ কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৬৭০৬৮৬
❒ ৩৮/৩ বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১২৫৬৬০

ISBN : 984-70012-0001-0

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৯৭
পঞ্চম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০১২

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দিন

শব্দ বিন্যাস : মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আহমদ
আহ্সান কম্পিউটার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২২১৯৫

মুদ্রণ
র‍্যাকস প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
কাটাবন, ঢাকা-১২০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ বিশ টাকা মাত্র

Islami Netritto Written by A K M Nazir Ahmad & Published by Ahsan Publication, Dhaka, First Edition May 1997 Fifth Edition September 2012, Fixed Price Taka : 20.00 Only. (US $ 1.00)

AP-07/50

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামী নেতৃত্ব

আল ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত দীন বা জীবন বিধান। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে বলে ইকামাতে দীন। কোন একটি ভূ-খণ্ডে সমাজের সকল স্তরে, সকল দিকে ও বিভাগে ইসলামী বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলেই বলতে হবে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন কায়েমের প্রচেষ্টা চালিয়ে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনই হচ্ছে মুমিন জীবনের আসল লক্ষ্য। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন কখনো আপনা আপনি কায়েম হয়ে যায় না। এর জন্য প্রয়োজন আন্দোলন। আর আন্দোলন মানে হচ্ছে লক্ষ্য হাসিলের জন্য একদল মানুষের সমন্বিত প্রয়াস।

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন কায়েমের আন্দোলনকে বলা হয় আল্লাহর পথে জিহাদ। বাংলা ভাষায় 'ইসলামী আন্দোলন' পরিভাষা আল্লাহর পথে জিহাদকেই বুঝায়। আন্দোলনের জন্য চাই সংগঠন। নেতৃত্ব এবং একদল কর্মী না হলে সংগঠন হয় না। সংগঠনে বহু সংখ্যক কর্মী থাকে। নেতার সংখ্যা থাকে কম। কম সংখ্যক হলেও নেতৃত্বকেই সংগঠনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়।

১. ইসলামী নেতৃত্ব ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নবীদের উত্তরসূরী

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দূর অতীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার জন্য নবী রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। আদম (আ) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত বহু সংখ্যক নবী রাসূল পৃথিবীর বিভিন্ন ভূ-খণ্ডে আবির্ভূত হয়ে আল্লাহ-প্রদত্ত জীবন বিধান আল ইসলামকে মানব সমাজে কায়েম করার আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এই প্রসংগে মহান আল্লাহ বলেন,

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا ـ

"আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম (যাতে) আমার নির্দেশে তারা লোকদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়।" (সূরা আল আম্বিয়া : ৭৩)

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী আবির্ভূত হবেন না। কিন্তু তাঁর প্রতি নাযিলকৃত আল-কুরআন এবং সেই আল-কুরআনকে আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাহ অবিকৃতভাবে বিদ্যমান। আল্লাহর রাসূলের (সা) ইন্তিকালের পর যুগে যুগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতৃত্ব আল ইসলামকে আল্লাহর যমীনে কায়েম করার জন্য বিভিন্ন ভূ-খণ্ডে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। আজো সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। যেইসব মহান ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের (সা) দেখানো পদ্ধতিতে আল ইসলামকে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁরা দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নবী রাসূলদের উত্তরসূরীর ভূমিকাই পালন করছেন।

এই নিরিখে বিচার করলে ইসলামী নেতৃত্বের রয়েছে একটি বড়ো মর্যাদা। সেই কারণে তাঁদের দায়িত্ব বড়ো। তাঁদের সব সময় সজাগ থাকা উচিত যাতে তাঁদের কথা, কাজ এবং আচরণে এমন কিছু প্রকাশ না পায় যা নবীর উত্তরসূরীর জন্য শোভনীয় নয়।

২. 'কথার অনুরূপ কাজ' ইসলামী নেতৃত্বের প্রধান ভূষণ

অনুগামী ও কর্ম এলাকার লোকদের মাঝে আল ইসলামের জ্ঞান বিতরণ ইসলামী নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান কাজ। কিন্তু অনুগামীগণ কিংবা কর্ম এলাকার লোকেরা যদি নেতৃত্বের বাস্তব জীবনে আল ইসলামের অনুশীলন দেখতে না পায়, শুধু মুখের কথা শুনেই তারা অনুপ্রাণিত হয় না। যেইসব নেতা মুখে সুন্দর সুন্দর কথা বলেন অথচ তাঁদের জীবনে সেইসব সুন্দর কথার প্রতিফলন থাকে না, লোকেরা তাঁদেরকে কপট নেতা গণ্য করে। এই ধরনের নেতৃবৃন্দ কখনো লোকদের শ্রদ্ধাভাজন হতে পারেন না। কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য লোকেরা কখনো কখনো তাঁদের কথা মেনে নিতে বাধ্য হলেও তাদের অন্তরে এইসব নেতার প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ, কোন ভালোবাসা থাকে না।

লোকেরা যখন দেখতে পায় যে নেতাগণ যেইসব কাজ করার জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করছেন, তাঁরা নিজেরাও সেইসব কাজ করে থাকেন, তখন তারা নেতাদেরকে নীতিবান নেতা বলে স্বীকার করে, তখন তারা তাঁদের কথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। নীতিবান নেতৃত্বের নিরাপোষ ভূমিকাই সাধারণ লোকদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকে। এমন নেতৃত্বের নির্দেশ মতো কাজ করতে তারা উৎসাহ বোধ করে।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) আল-কুরআনের শিক্ষা লোকদের সামনে পেশ

করতেন। লোকেরা দেখতে পেতো যে তিনি যেই শিক্ষার কথা মুখে উচ্চারণ করছেন সেই শিক্ষা অনুযায়ীই তাঁর জীবন পরিচালনা করছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁর জীবন ছিলো আল-কুরআনেরই জীবন্ত রূপ। বৈসাদৃশ্যহীন, বৈপরীত্যহীন পরিচ্ছন্ন জীবন তাঁকে অসাধারণ করে তুলেছিলো, তাঁকে অনুকরণীয় অনুসরণীয় করে তুলেছিলো।

'কথার অনুরূপ কাজ' না করা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দৃষ্টিতে খুবই গর্হিত। এমন চরিত্রের লোকদের সমালোচনা করেই তিনি বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ.

'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, যেই কাজ তোমরা নিজেরা কর না তা বল কেন? আল্লাহর নিকট এটি গর্হিত কাজ যে তোমরা এমন কথা বল যা তোমরা কর না।' (সূরা আস সাফ : ২, ৩)

ইসলামী নেতৃত্বকে অবশ্যই পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে হবে। তাঁদের কথা ও কাজের মাঝে যাতে কোন বৈপরীত্য না থাকে সেই ব্যাপারে তাঁদেরকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। 'কথার অনুরূপ কাজ'ই তাঁদেরকে লোকদের নিকট শ্রদ্ধাস্পদ করে তুলবে। নেতৃত্ব যদি লোকদের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা কুড়াতে না পারেন তবে তো তাঁদেরকে ব্যর্থ নেতৃত্বই বলতে হবে।

৩. মানুষের কল্যাণ কামনা ইসলামী নেতৃত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

ইসলামী নেতৃত্ব মানুষের সুখ, শান্তি এবং কল্যাণের কথা ভেবে থাকেন। তাঁরা নিশ্চিত যে মানব রচিত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করে মানুষের সুখ, শান্তি এবং কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। মানুষের দুনিয়ার জীবনের কল্যাণ এবং আখিরাতের জীবনের নাজাতের কথা ভেবেই তাঁরা পেরেশান। কল্যাণ এবং মুক্তির পথে মানুষকে নিয়ে আসার জন্যই তাঁরা তৎপর।

প্রাচীন ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিলেন নূহ (আ)। তিনি লোকদেরকে বলেন,

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ.

'আমি তোমাদের নিকট আমার রবের পয়গাম পৌঁছাই। আমি তোমাদের কল্যাণ

কামনা করি। আমি আল্লাহর নিকট থেকে এমন সব বিষয় জানি যা তোমরা জান না।' (সূরা আল আরাফ : ৬২)

প্রাচীন আরবের আদ জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন হূদ (আ)। তিনি লোকদেরকে বলেন,

أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ.

'আমি তোমাদের নিকট আমার রবের পয়গাম পৌঁছাই। আমি তোমাদের নির্ভরযোগ্য কল্যাণকামী।' (সূরা আল আরাফ : ৬৮)

প্রাচীন আরবের আরেক জাতি ছিলো ছামূদ জাতি। এই জাতির নিকট প্রেরিত হন ছালিহ (আ)। লোকদেরকে সম্বোধন করে তিনি বলেন,

يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لاَّ تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ.

'ওহে আমার কাউম, আমি তোমাদের নিকট আমার রবের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। আমি তোমাদের কল্যাণই চেয়েছি। কিন্তু তোমরা তো কল্যাণকামীদেরকে পছন্দ কর না।' (সূরা আল আরাফ : ৭৯)

প্রাচীন আরবের উত্তরাঞ্চলে বাস করতো মাদইয়ান জাতি। এদের নিকট প্রেরিত হন শুয়াইব (আ)। তিনি লোকদেরকে ডেকে বলেন,

يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ج فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ.

'ওহে আমার কাউম, আমি আমার রবের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। আমি তোমাদের কল্যাণ চেয়েছি।' (সূরা আল আরাফ : ৯৩)

তাঁদের মতো সকল নবীই মানুষের কল্যাণকামী ছিলেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত লাভের পূর্বেও ছিলেন একজন অসাধারণ মানবদরদী মানুষ। মানুষের কল্যাণকামী ছিলেন বলেই তিনি সতর বছর বয়সে 'হিলফুল ফুদুল' নামক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।

চল্লিশ বছর বয়সে জাবালে নূরের হিরা গুহায় অবস্থানকালে জিবরীলকে (আ) দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়েন। বাড়িতে ছুটে এসে স্ত্রী খাদীজাহ বিনতু

খুয়াইলিদকে বলেন তাঁর গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিতে। কিছুক্ষণ পর তাঁর গায়ের কম্পন দূর হয়। তিনি স্ত্রীকে বলেন, 'আমার তো জীবনের ভয় ধরে গেছে।' খাদীজাহ (রা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "আপনি আশ্বস্ত হোন, আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করে থাকেন। সর্বদা সত্য কথা বলেন। অসহায় লোকদের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। নিজের উপার্জিত অর্থ দরিদ্রদেরকে দান করেন। ভালো কাজে লোকদের সহযোগিতা করেন।"

খাদীজাহ বিনতু খুয়াইলিদের (রা) বক্তব্যে মানব দরদী, মানুষের কল্যাণকামী মুহাম্মাদের (সা) পরিচয় ফুটে উঠেছে। আর তিনি যখন নবী হলেন তখন তো আরো বেশি মানব দরদী হয়ে ওঠেন। শুধু দুনিয়ার জীবন নয় মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনেও মানুষ যাতে সুখী হতে পারে সেই জন্য তিনি লোকদেরকে আল্লাহর পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতে থাকেন।

আল্লাহর পথ পরিহার করে মানুষ যখন ইবলীসের পথে চলে তখন তাদের জীবনে সৃষ্টি হয় অসংখ্য জটিলতা। সমস্যার আবর্তে তারা ঘুরপাক খেতে থাকে। অশান্তির আগুনে তারা পুড়তে থাকে। তদুপরি আখিরাতের কঠিন আযাব তো তাদের জন্য অপেক্ষমান।

এই অবস্থা দেখে ইসলামী নেতৃত্ব কখনো উল্লসিত হন না। মনের গভীরে তাঁরা দারুণ ব্যথা অনুভব করেন। দুঃখী মানুষের দুঃখ বেদনা লাঘবের জন্য তাঁরা এগিয়ে আসেন। মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য মানুষের চিন্তা-চেতনা থেকে জাহিলিয়াতের মূলোৎপাটন করে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে কল্যাণময় সমাজ গঠনের উপাদানে পরিণত করার চেষ্টা চালাতে থাকেন।

ইসলামী নেতৃত্ব জানেন যে মানুষের মন্দ আচরণের মূলে রয়েছে মন্দ চিন্তা-চেতনা। এই মন্দ আচরণ দেখে মানুষকে ঘৃণা না করে মানুষের মন্দ চিন্তা-চেতনা দূর করার দিকেই তাঁরা নজর দেন। কারণ মন্দ চিন্তা-চেতনা দূর হলেই মানুষের জীবন থেকে মন্দ আচরণ বিদূরিত হয়।

ইসলামী নেতৃত্বই মানুষের প্রকৃত কল্যাণকামী। দুর্ভাগা মানুষেরা এই মহা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে তারা তাদের কল্যাণকামীদেরকেই তাদের দুশমন মনে করে এবং তাঁদের সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকে। ইসলামী নেতৃত্ব এই দুর্ভাগাদের প্রতি দরদী এবং ক্ষমাশীল মন নিয়ে তাকান। দিনরাত তাদের কল্যাণের কথাই ভাবেন। যাঁদের অন্তরে মানব প্রেমের ফলগুধারা নেই

ইসলামী নেতা হওয়ার যোগ্যতা তাঁদের নেই। 'রাহমাতুললিল আলামীনের' উত্তরসূরী হওয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাঁদের মাঝে নেই।

৪. ইসলামী নেতৃত্বের বুনিয়াদী কাজ ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠন

ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য চাই ইসলামী ব্যক্তিত্ব। যাদের জীবনে ইসলাম নেই তারা সমাজে ইসলাম কায়েম করবেন কিভাবে? আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ط

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যেই পর্যন্ত না তারা তাদের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে।" (সূরা আর রাদ : ১১)

এই আয়াতটিতে রয়েছে সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ইসলামী কনসেপ্ট। এই আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে একটি জাতির ব্যক্তিবর্গ তাদের জীবনধারা যেইভাবে গড়ে তোলে, সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবনে সেই ধারাই বিকশিত হয়। অর্থাৎ কোন জাতিকে যদি সামগ্রিকভাবে পরিবর্তন করতে হয় তাহলে প্রথমে জাতির লোকদের চরিত্রে পরিবর্তন আনতে হবে। আবার এটাও সত্য যে চিন্তাধারায় পরিবর্তন সাধন না করে কারো চরিত্রে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষের প্রকৃতি। মানুষের জীবনে পরিবর্তন সাধনের প্রক্রিয়া একমাত্র তাঁরই জানা।

মেহেরবান আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত তাঁর জীবন দর্শন মানুষের সামনে উপস্থাপন করার দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁদেরকে। নবী রাসূলগণ প্রথমে মানুষের চিন্তা-চেতনাকে আলোড়িত করতে চেয়েছেন। মানুষের চিন্তাজগতে ইসলামী জীবন দর্শনের বীজ বপন করার চেষ্টা করেছেন। যাদের চিন্তাজগত ইসলামী জীবন দর্শন ধারণ করেছে তাদের কর্ম জগতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মেই।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা) একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

"তিনিই সেই সত্তা যিনি উম্মীদের জন্য তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূলের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াত পড়ে শুনায়, তাদের তাযকিয়া করে এবং তাদেরকে আল কিতাব ও আল হিকমাহ শিক্ষা দেয়।" (সূরা আল জুমুআ : ২)

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

"যেমন আমি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছি যাতে সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে আল কিতাব ও আল হিকমাহ শিক্ষা দেয় এবং যেইসব কথা তোমাদের জানা ছিলো না তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়।" (সূরা আল বাকারা : ১৫১)

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ج وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি এই অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল বানিয়েছেন, যে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শুনায়, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে আল কিতাব ও আল হিকমাহ শিক্ষা দেয়।" (সূরা আলে ইমরান : ১৬৪)

মুহাম্মাদ (সা) সর্বশেষ নবী। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিয়ামাত পর্যন্ত আল-কুরআনকে অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। মহানবীর (সা) দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়াতী যিন্দেগীর যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিবরণও অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে।

এই যুগের ইসলামী নেতৃত্বের কর্তব্য হচ্ছে মহানবীর (সা) অনুকরণে আল-কুরআনকে মানুষের সামনে পেশ করা, আল-কুরআনে উপস্থাপিত জীবন দর্শনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা এবং আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে জীবনকে ঢেলে সাজানোর জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। যারা আল-কুরআনের জীবন দর্শনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে তারাই খাঁটি মুমিন।

আর এই মুমিনগণ যাবতীয় গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থেকে এবং যাবতীয় নেক আমল অনুশীলন করে তাদের জীবনকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে নিক, এটাই আল্লাহর অভিপ্রায়।

কোন ভূ-খণ্ডের বিপুল সংখ্যক লোক যখন এইভাবে গড়ে ওঠে তখনই তৈরি হয় ইসলামী গণভিত্তি। আর এই গণভিত্তি ইসলামী সমাজ নির্মাণের বুনিয়াদ। ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের জন্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠন হচ্ছে ইসলামী নেতৃত্বের বুনিয়াদী কাজ।

৫. কঠোরতা নয় কোমলতা অবলম্বনই ইসলামী নেতৃত্বের প্রধান সাংগঠনিক নীতি

ইসলামী আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরাম তাঁদের অনুগামীদের প্রতি খুবই কোমল ছিলেন। তাঁরা অনুসারীদের সাথে কঠোর আচরণ করতেন না। তাদের সাথে কর্কশভাবে কথা বলতেন না। তাদেরকে তিরস্কার করতেন না। তাদেরকে গালমন্দ করতেন না।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের (সা) জীবন চরিত বিস্তারিতভাবে লিখিত রয়েছে। তাঁর জীবনে মন্দ আচরণের কোন উদাহরণ নেই। তিনি অনুগামীদেরকে তাদের আগেই সালাম দিতেন। হাসিমুখে তাদের সাথে কথা বলতেন। কখনো রাগান্বিত হলে তিনি তা কাউকে বুঝতে দিতেন না। তিনি যখন রাগতেন চেহারায় রক্তিমাভা ফুটে ওঠতো। চেহারায় ঘাম দেখা দিতো। এ থেকে লোকেরা আন্দাজ করতো যে রাসূলুল্লাহ (সা) রাগান্বিত হয়েছেন। রাগান্বিত অবস্থায় তিনি কাউকে বকাঝকা করতেন না। কটুকথা বলতেন না।

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (সা) সম্বোধন করে বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ.

"ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর।" (সূরা আল আরাফ : ১৯৯)

অনুগামীদের প্রতি তিনি সব সময়ই ছিলেন সহনশীল ও ক্ষমাশীল। তিনি ছিলেন بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ. "মুমিনদের প্রতি দরদী ও করুণাসিক্ত।" (সূরা আত তাওবা : ১২৮)

আল্লাহর রাসূলের (সা) অনুগামীগণ মানুষই ছিলেন। ফলে তাঁদের ভুলভ্রান্তি হতো। কিন্তু তাঁদের ভুলভ্রান্তি দেখে তিনি ক্ষেপে ওঠতেন না। সংশোধনের লক্ষ্যে বিনম্র ভাষায় তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

তাঁর কথা ও কাজে ছিলো মাধুর্য। তাঁর অমায়িক ব্যবহার তাঁকে এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিলো। তাঁর মুখে মধুর বাণী শুনার জন্য, তাঁর সান্নিধ্যে থেকে প্রাণ জুড়াবার জন্য যখনই সুযোগ পেতো তাঁর অনুগামীগণ তাঁর কাছে ছুটে আসতো। তারা সহজে তাঁর সান্নিধ্য ত্যাগ করতে চাইতো না। মহানবীর (সা) আচরণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ নিজেই বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص

"এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে তুমি তাদের প্রতি নম্র স্বভাবের হয়েছো। যদি তুমি কঠোর ভাষা ও কঠোর চিত্তের লোক হতে লোকেরা তোমার চারদিক থেকে ভেগে চলে যেতো।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথীগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, কিন্তু পরস্পর রহম দিল।" (সূরা আল ফাতহ : ২৯)

কাফিরদের প্রতি কঠোর মানে এই নয় যে, তাঁরা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতো। বরং কাফিরদের অনুসৃত মত ও পথের প্রতি তাঁদের ভূমিকা ছিলো নিরাপোষ। আবার কাফিরগণ যখন তাঁদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিতো তখন ইস্পাতের দৃঢ়তা নিয়ে তাঁরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতো। কিন্তু এই ইস্পাত কঠিন মানুষগুলো যখন একের সাথে অপরজন মেলামেশা করতো, আলাপ করতো, তখন একটি মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হতো। তাঁদের আচরণে সহমর্মিতা ও প্রীতি সম্প্রীতির উষ্ণতা প্রকাশ পেতো।

পরবর্তীকালে ইসলামী নেতৃত্ব যাতে অনুগামীদের প্রতি কোমল আচরণ করে সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) বলেছেন, "নিকৃষ্ট

দায়িত্বশীল ওই ব্যক্তি, যে অধীন ব্যক্তিদের প্রতি কঠোর। সাবধান থাকবে যাতে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পড়।" (সহীহ্ আল-বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

আয়িশা (রা) বলেন যে নবী (সা) বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোমল। তিনি কোমলতা ভালোবাসেন। তিনি কোমলতা দ্বারা ওই জিনিষ দান করেন যা কঠোরতা দ্বারা দান করেন না।" (সহীহ্ মুসলিম)

এই যুগের ইসলামী নেতৃত্বকেও আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে উদারতা-ক্ষমাশীলতা-কোমলতাকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁদের অনুগামীদের সাথে আচরণ করা উচিত। ইসলামী শারীয়ার বিধান লঙ্ঘন করার কারণে আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর কোন কোন অনুগামীকে কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু ওই ব্যক্তিদেরকেও তিনি গালমন্দ করেননি। তাদের সাথে অশোভন আচরণ করেননি।

এই যুগের ইসলামী নেতৃত্বকেও তাঁদের অনুগামীদের কারো কারো বিরুদ্ধে বিশেষ কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। এতদসত্ত্বেও তাঁদের ব্যক্তিগত আচরণ বিন্দুমাত্র অভদ্রজনোচিত হবে না।

সংগঠনের সকল কর্মী একই মানের থাকে না। তাই সকলের কাজও একই মানের হয় না। মেধার পার্থক্য, বয়সের পার্থক্য, সুস্থতা-অসুস্থতা, সমস্যার স্বল্পতা কিংবা আধিক্য ইত্যাদি কারণে সকলের কাজের মান এক হবে না, হতে পারে না।

বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্বকে অনুগামীদের ওপর বিশেষ বিশেষ কাজ চাপাতে হয়। কাজ চাপানোর আগে উপরোক্ত বিষয়গুলো ভালোভাবে বিবেচনা করে সঠিক ব্যক্তির ওপর সঠিক কাজ চাপানো উচিত। কাজ চাপানোর আগেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিষয় ভালোভাবে অবহিত হয়ে তবেই কাজ চাপানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

৬. শূরা ইসলামী নেতৃত্বের নিরাপত্তা বেষ্টনী

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নেতৃত্বকে নির্দেশ প্রদানের অধিকার দান করেছেন। নেতৃত্বের নির্দেশ পালন অনুগামীদের ওপর ফারয করেছেন। নেতৃত্ব কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যই অনুগামীদেরকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। যদিও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ প্রদানের অধিকার নেতৃত্বকে দেয়া হয়েছে কিন্তু এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নেতৃত্বকে দেয়া হয়নি। মহাবিজ্ঞ আল্লাহ বলেন,

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ص

"তাদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিষ্পন্ন হয়।" (সূরা আশ শূরা : ৩৮)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যক্তিগতভাবে খুবই বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। নবী হওয়ার পূর্বেই কা'বা সংস্কারের পর হাজরে আসওয়াদ যথাস্থানে সংস্থাপনের জন্য বিবাদমান গোত্রগুলোর বিবাদ তিনি যেইভাবে মীমাংসা করেছিলেন তাতে তাঁর অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় মেলে। কিন্তু এই বিচক্ষণ ব্যক্তিটির প্রতিও আল্লাহর নির্দেশ ছিলো,

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ج

"সামষ্টিক বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

যেই বিষয়ে আল্লাহ ওহী পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহকে (সা) নির্দেশ দিতেন না, সেইসব বিষয়ে তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতেন। বদর প্রান্তরে পৌছে একটি স্থান দেখিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে তাঁবু স্থাপন করতে বলেন। যুদ্ধ বিশারদ সাহাবীগণ জানতে চান যে ওই স্থানে তাঁবু স্থাপনের জন্য তিনি কি আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট। রাসূলুল্লাহ (সা) না সূচক জবাব দিলে তাঁরা অপর একটি স্থানের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলেন যে তাঁদের মতে যুদ্ধ কৌশলের দৃষ্টিতে ওই স্থানটিতে তাঁবু স্থাপন করলে ভালো হয়। আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় স্থানটিতে তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ দেন।

উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মাসজিদে নববীতে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করতে বসলেন আল্লাহর রাসূল (সা)। বিবেচ্য বিষয় ছিলো : শহরে অবস্থান করে যুদ্ধ করা, না শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা। অধিকাংশ সাহাবী শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করে আল্লাহর রাসূল (সা) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে উহুদ প্রান্তরে গিয়ে সৈন্য সমাবেশ করেন।

যেইসব সিদ্ধান্তের সাথে বহু সংখ্যক লোকের ভাগ্য জড়িত সেইসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাদের সকলের অথবা তাদের প্রতিনিধিদের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন। আন্দোলনের জীবনে এমন সময়ও আসে যখন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এমন সিদ্ধান্ত নেতৃত্ব যদি একা একা গ্রহণ করেন এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যদি জান ও মালের বিপুল ক্ষতি হয়, তাহলে পরবর্তী সময়ে নেতৃত্বকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে। ব্যর্থতার সব গ্লানি তাঁদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা হতে পারে। কিন্তু সিদ্ধান্তটা যদি সকলের সাথে

কিংবা তাদের প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করে গ্রহণ করা হয় তখন নেতৃত্বের ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে না কেউ।

তাছাড়া এটা অনস্বীকার্য যে বহু সংখ্যক লোক বিভিন্ন দিক দেখে শুনে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটাই স্বাভাবিক। একজন মাত্র ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিলে তাঁর দ্বারা একটি বেঠিক সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়ে যেতে পারে। দুনিয়ার ডিকটেটারদের ইতিহাস তার সাক্ষী। দুনিয়াতে যেইসব ডিকটেটারের আবির্ভাব ঘটেছে তারা কিন্তু বোকা লোক ছিলো না। তাদের বহু সিদ্ধান্তই সঠিক ছিলো। কিন্তু একা একা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তারা কখনো কখনো এমন সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যা একদিকে তাদের নিজের জন্য, অপরদিকে তাদের জাতির জন্য বড়ো রকমের অকল্যাণ ডেকে এনেছে। তারা ধিকৃত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে। তাদের কারো কারো অপমৃত্যু ঘটেছে।

মহান আল্লাহর নির্দেশে ইসলামী নেতৃত্বকে শূরা বা পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাই তাদেরকে ডিকটেটারদের করুণ পরিণতির সম্মুখীন হতে হয় না। সেই জন্যই বলছিলাম, শূরা ইসলামী নেতৃত্বের নিরাপত্তা বেষ্টনী।

৭. বাগ্মিতা ইসলামী নেতৃত্বের শানিত হাতিয়ার

বক্তৃতা-ভাষণের যোগ্যতাই বাগ্মিতা। বক্তৃতা-ভাষণের মাধ্যমেই নবী রাসূলগণ তাঁদের কাউমের নিকট ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কিত বিভিন্ন কনসেপ্ট তুলে ধরেন। সকল নবীই ছিলেন সুবক্তা।

মূসা (আ) ভালো বক্তা ছিলেন। কিন্তু তাঁর বড়ো ভাই হারুন (আ) ছিলেন আরো বেশি ভালো বক্তা। আদদাওয়াতু ইলাল্লাহর কাজ করার জন্য বক্তৃতা-ভাষণের পারদর্শিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর হারুন (আ) যেহেতু এই ক্ষেত্রে পারদর্শী ছিলেন সেহেতু মূসা (আ) আল্লাহর নিকট আবেদন রাখেন যাতে হারুনকে (আ) তাঁর সহযোগী বানিয়ে দেন।

وَاَخِيْ هٰرُوْنَ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا يُّصَدِّقُنِيْٓ ز اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ.

"আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বেশি বাগ্মিতা সম্পন্ন, তাকে আমার সাহায্যকারী হিসেবে পাঠান যাতে সে আমার সত্যতা প্রমাণ করতে পারে।" (সূরা আল কাছাছ : ৩৪)

দাউদ (আ) এর বাগ্মিতা সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেন,

"আমি তার রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছি, তাকে আল হিকমাহ দান করেছি। আর দিয়েছি চূড়ান্ত বক্তব্য পেশ করার যোগ্যতা।" (সূরা ছোয়াদ : ২০)

অর্থাৎ দাউদের (আ) কথা পেঁচানো ও অস্পষ্ট হতো না। তিনি কি বুঝাতে চান তা বুঝতে কারো কষ্ট হতো না। তিনি যেই বিষয়ে কথা বলতেন তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠতো। আর শ্রোতাদের অন্তর বলে ওঠতো এই বিষয়ে এটাই তো প্রকৃত কথা, এটাই তো চূড়ান্ত কথা।

এই গুণটি কেবল দাউদকে (আ) দেয়া হয়েছিলো তা নয়, অন্যান্য নবী-রাসূলও এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহও (সা) একজন সুবক্তা ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা দীর্ঘ হতো না। কিন্তু তার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মাঝেই ভাব ও তত্ত্বজ্ঞান থাকতো অনেক বেশি। এই সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক ভাব প্রকাশক বক্তৃতা ভাষণের যোগ্যতাসহ আবির্ভূত হয়েছি।"

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) বিদায় হাজ্জে যেই ভাষণ দেন তা খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এই ভাষণের প্রতিটি বাক্যে যেই তাৎপর্য লুকিয়ে আছে তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বড়ো বড়ো গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) বক্তৃতার ভাষা ছিলো প্রাঞ্জল। শব্দগুলো ছিলো সহজ। ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তিনি পুনরাবৃত্তি করতেন। প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে বক্তব্য রাখতেন। তাঁর বক্তৃতা-ভাষণে আল-কুরআনের উদ্ধৃতি প্রাধান্য পেতো।

এই যুগের ইসলামী নেতৃত্বকেও বক্তৃতা-ভাষণে পারদর্শী হতে হবে। তাঁদেরকে আল-কুরআন এবং আল-হাদীসের জ্ঞান বক্তৃতা ভাষণের মাধ্যমেই অপরাপর মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। কিছু লোক বক্তৃতা-ভাষণের পারদর্শিতা সহজেই আয়ত্ত করতে পারেন। আবার কিছু লোককে তা আয়ত্ত করতে হয় খেটে খুটে। অর্থাৎ বক্তৃতা-ভাষণের প্রশিক্ষণ নিতে হয় তাদেরকে। দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছুকাল প্র্যাকটিস করলেই ভালো বক্তা হওয়া যায়।

৮. আমানাতদারী ইসলামী নেতৃত্বের মর্যাদার গ্যারান্টি

আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) বলেন, 'আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের ওপর যা কিছু ফারয করেছেন তাই আমানাত। আর আল্লাহর আদেশ কিংবা নিষেধ অমান্য করাই আমানাতের খিয়ানত।' আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, 'ছালাত,

অযু, গোসল, ক্রয়-বিক্রয়, দাঁড়িপাল্লা সবই আমানাত। আর গচ্ছিত সম্পদ হচ্ছে সবচে' বড়ো আমানাত।'

নেতা নির্বাচন কালে যোগ্যতম ব্যক্তির পক্ষে নিজের ভোট প্রদান করা আমানাতদারীর দাবি।

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানাতের হকদারের হাতে তা সোফর্দ করতে।" (সূরা আন্ নিসা : ৫৮)

কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে নিঃসংকোচে নিজের অভিমত ব্যক্ত করা আমানাতদারীর দাবি। সঠিক ব্যক্তিদেরকে তালাশ করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা আমানাতদারীর দাবি। যেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনুগামীগণ নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছে সেই লক্ষ্যাভিসারী কর্মকাণ্ডে তাদেরকে নিয়োজিত রাখা আমানাতদারীর দাবি।

সংগঠনের টাকা-পয়সা, ফাইলপত্র, আসবাব ইত্যাদি ছোট বড়ো সকল সম্পদ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা এবং সংগঠনের লক্ষ্য হাসিলের জন্য ব্যয়-ব্যবহার করা আমানাতদারীর দাবি।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, "মুনাফিকের আলামত তিনটি। যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং তার কাছে কিছু আমানাত রাখলে তার খিয়ানত করে।" (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, "যাঁর আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই। যার ওয়াদা পালন নেই তার দীনদারী নেই।" (আহমাদ, সহীহুল বুখারী, আত্তাবারানী)

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, "মানুষের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম যেই সদগুণটি তিরোহিত হবে তা হচ্ছে আমানাতদারী।" ইসলামী নেতৃত্বকে আমানাতদারীর পূর্ণাঙ্গ কনসেপ্ট-এর সাথে পরিচিত হতে হবে। তাঁদেরকে সর্বাবস্থায় আমানাতের হিফাযতের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

আমানাতের খিয়ানতকারীকে কেউ পছন্দ করে না। তাকে কেউ শ্রদ্ধা করে না। তার কথায় কেউ আস্থা স্থাপন করে না। তাকে কেউ নির্ভরযোগ্য মনে করে না। তাকে কেউ মর্যাদাবান লোক গণ্য করে না।

পক্ষান্তরে আমানাতদার লোককে লোকেরা ভালোবাসে। শ্রদ্ধা করে। তাকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করে। তাকে মর্যাদাবান লোক বলে স্বীকার করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে আমানাতদারী গুণটি একজন ব্যক্তির মর্যাদার হিফাযতকারী হয়ে থাকে। তাই ইসলামী নেতৃত্বকে অবশ্যই সকল বিষয়ে আমানাতদার হতে হবে।

৯. যোগ্য উত্তরসূরী সৃষ্টি ইসলামী নেতৃত্বের বড়ো সফল্‌তা

কোন মানুষই দুনিয়ায় অমর নয়। আজ যাঁরা ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরাও অমর নন। তাই আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য নেতৃত্ব তৈরি করে যাওয়া তাদের কর্তব্য। ইবরাহীম (আ) দুনিয়ার বিশাল এলাকায় আল ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আবার, আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে নেতৃত্ব দেবার জন্য তিনি ইসমাইল (আ), ইসহাক (আ) এবং লূতকে (আ) তৈরি করে গেছেন।

মূসা (আ) বানু ইসরাইলকে নিয়ে ট্রান্স জর্ডনের বিশাল এলাকায় ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর পরবর্তী মানযিল ছিলো ফিলিস্তিন। কিন্তু সেখানে পৌছার আগেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর হাতে গড়া ইউশা বিন নূন এবং কালিব বানু ইসরাইলকে নেতৃত্ব দিয়ে ফিলিস্তিনে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ২৩ বছরের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে মাদীনাকে কেন্দ্র করে গোটা জাযিরাতুল আরবে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন। আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার সাথে সাথে তিনি একদল লোকও গঠন করে যান। তাঁর ইন্তিকালের পর আবু বাকর আছছিদ্দিক (রা), উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), উসমান ইবনু আফফান (রা) এবং আলী ইবনু আবি তালিব (রা) একে একে আমীরুল মুমিনীন হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

বর্তমানে যাঁরা ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদেরকে এই বিষয়টি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বিষয়ের তালিকায় রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সংগঠনের জনশক্তিকে স্টাডি করে মৌলিক মানবীয় গুণসম্পন্ন লোক বাছাই করতে হবে।

সাধারণত পরিশ্রমপ্রিয়তা, বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি, সূক্ষ্মদৃষ্টি, প্রখর স্মৃতি শক্তি, প্রশস্তচিত্ততা, স্থির চিত্ততা, ভারসাম্যপূর্ণ মিজাজ, উদ্ভাবন শক্তি, বাগ্মিতা, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা প্রভৃতি গুণকে মৌলিক মানবীয় গুণ বলা হয়। ইসলামী আন্দোলনের জন্য শুধু মৌলিক মানবীয় গুণ যথেষ্ট নয়। এর সাথে সমন্বিত

থাকতে হবে চিন্তার বিশুদ্ধতা এবং উন্নত নৈতিকতা। নেতৃত্বকে বাছাই করতে হবে মৌলিক মানবীয় গুণ, চিন্তার বিশুদ্ধতা এবং উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন ভারসাম্যপূর্ণভাবে অগ্রসরমান কিছু সংখ্যক কর্মী।

বাছাইকৃত ব্যক্তিদেরকে ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য, প্রকৃতি, নির্বাচন পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি, সংশোধন পদ্ধতি, সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি, রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ পদ্ধতি, হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি শেখাতে হবে।

বাছাইকৃত কর্মীদেরকে বিশুদ্ধভাবে আল-কুরআন তিলাওয়াত, উন্নত মানের দারসুল কুরআন প্রদান এবং আকর্ষণীয় বক্তৃতা-ভাষণ প্রদানের পদ্ধতি শেখাতে হবে। তাদের জন্য বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে তাদের সাথে ব্যক্তিগত আলাপ করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেয়াও জরুরী। যতো বেশি সম্ভব তাদেরকে সাহচর্য দান করা উচিত।

এইভাবে যাদের পেছনে শ্রম দেয়া হবে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব তাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে।

যোগ্য সংগঠকের পরিচয়

কারো পক্ষে সংগঠক বনে যাওয়া কঠিন কিছু নয়, কিন্তু যোগ্য সংগঠক হওয়া সত্যি কঠিন। সংগঠনের কিছু রুটিন ওয়ার্ক সম্পন্ন করা খুবই সহজ, কিন্তু সংগঠনে প্রাণ-বন্যা সৃষ্টি করা মোটেই সহজ নয়।

সংগঠনে প্রাণ-বন্যা সৃষ্টি করা এবং তা অব্যাহত রাখা একজন যোগ্য সংগঠকের পক্ষেই সম্ভব। বহুমুখী কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে একজন যোগ্য সংগঠক তাঁর যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে যান। সংগঠনের সর্বত্র প্রাণচাঞ্চল্য এবং গতিশীলতা অব্যাহত রেখে সংগঠনটিকে উত্তরোত্তর অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম সংগঠকই যোগ্য সংগঠক।

একজন যোগ্য সংগঠক একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তাঁর প্রতি কর্মী বাহিনী স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধাবনত থাকে। আর এই শ্রদ্ধা কর্মীদের মনে বিনা কারণেই উৎসারিত হয় না। সংগঠকের উন্নত মানের সততা ও যোগ্যতাই তাঁকে কর্মীদের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত করে। কর্মীরা যদি সংগঠককে প্রাণভরে ভালোবাসতে পারে তাহলে তাঁর নির্দেশে তারা যেই কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তাঁর নির্দেশ পালনে তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা বা কুণ্ঠা থাকে না।

শ্রদ্ধাভাজন সংগঠককে কড়া নির্দেশ দিয়ে কর্মীদেরকে কাজে নামাবার প্রয়াস চালাতে হয় না। তাঁর ইঙ্গিত বা অনুরোধই কর্মীদেরকে কর্মচঞ্চল করার জন্য যথেষ্ট। একজন সংগঠক বিভিন্নমুখী যোগ্যতার বিকাশ ঘটিয়ে যোগ্য সংগঠকের স্তরে উন্নীত হন। এখানে আমরা অতি সংক্ষেপে কিছু যোগ্যতার কথা আলোচনা করবো।

১. জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব

একজন সংগঠককে অবশ্যই জ্ঞানী ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন। আদর্শ, আন্দোলন ও সংগঠন সংক্রান্ত যেই কোন প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেবার মতো জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও গভীরতা তাঁর থাকা চাই। বিরোধী মতবাদগুলোর বক্তব্য সম্পর্কেও

তাঁকে থাকতে হবে ওয়াকিফহাল। সেইগুলোর ভ্রান্তি ও পূর্ণাঙ্গতা সম্পর্কেও তাঁর অবগতি থাকা প্রয়োজন।

২. উন্নত আমল

একজন আদর্শ সংগঠককে অবশ্যই আদর্শের মূর্ত প্রতীক হতে হবে। আদর্শের দৃষ্টিতে পালনীয় বিষয়গুলোর অনুশীলনের ক্ষেত্রে নিষ্ঠাই হবে তাঁর জীবনের প্রকৃত ভূষণ। তাঁর আমল হতে হবে অন্যদের জন্য অনুকরণযোগ্য।

৩. সুন্দর ব্যবহার

একজন যোগ্য সংগঠকের ব্যবহার অবশ্যই সুন্দর হতে হবে। তিনি কখনো রুক্ষভাষী হবেন না। তাঁর আচরণ রূঢ় হবে না। বরং তাঁর আচরণ কর্মীদেরকে চুম্বকের মতো কাছে টেনে নিয়ে আসার মতো মধুর হওয়া চাই।

৪. অগ্রণী ভূমিকা পালন

সংগঠনের কাজ আগ বাড়িয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অথবা কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের ক্ষেত্রে সংগঠকেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। এইসব বিষয় নিয়ে তিনিই বেশি বেশি ভাববেন, তিনিই নতুন নতুন চিন্তা পেশ করবেন, নতুন নতুন কর্মকৌশল তিনিই উদ্ভাবন করবেন। এইভাবে চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্ব দেবেন। আবার বহির্মুখী কর্মকাণ্ডেও তিনিই ইনিশিয়েটিভ গ্রহণ করবেন। মোটকথা, চিন্তা ও কাজ উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর ভূমিকা হবে অগ্রণী ভূমিকা।

৫. সাহসী ভূমিকা পালন

যেই সংগঠন সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী সেই সংগঠনকে প্রতিষ্ঠিত সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ভালো চোখে দেখবে- এটা স্বাভাবিক নয়। প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে যারা যুলুম ও শোষণ চালায় তারা যে এই সংগঠনের অগ্রগতি দেখে আঁতকে ওঠে শুধু তাই নয়, বরং এই সংগঠনের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেবার জন্য নানা ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতা এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর সওয়ার হয়ে বহুবিধ নির্যাতন ও নিপীড়ন চালায়। ফলে সংগঠন নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এই ভীতিপ্রদ পরিস্থিতিতে সংগঠককে শক্তভাবে সংগঠনের হাল ধরে থাকতে হয়। একজন যোগ্য সংগঠকের চেহারা ও কর্মকাণ্ডে এমন পরিস্থিতিতেও ভীতির চিহ্ন ফুটে ওঠবে না। তাঁর এই সাহসী ভূমিকাই কর্মীদেরকে সাহসী করে তুলবে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি মুকাবিলা করে সামনে এগুবার হিম্মত যোগাবে।

৬. সঠিক মানের কর্মী গঠন

সংগঠনের সঠিক মানের কর্মী তো তারাই যারা এর আদর্শ ও আন্দোলনকে সঠিকভাবে বুঝেছে, সংগঠনের লক্ষ্য ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে, এর কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি বুঝে শুনে গ্রহণ করেছে, এর নির্বাচন পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি, সমালোচনা পদ্ধতি, কর্মী গঠন পদ্ধতি ইত্যাদি ভালোভাবে বুঝেছে এবং শুধু জানা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না থেকে তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী বাস্তব ময়দানে ভূমিকাও পালন করে চলছে।

এই মানে কর্মীদের গড়ে তোলার জন্য সংগঠক সাংগঠনিক প্রক্রিয়াগুলোর ওপর তো নির্ভর করবেনই, তদুপরি তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এই বিষয়ের দিকে কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

ব্যক্তিগত সাক্ষাত ও আলাপের মাধ্যমে জ্ঞানের মান ও কর্মতৎপরতার মান ভালোভাবে আঁচ করে পরামর্শ দেবেন। এইভাবে কর্মীদের সঠিক মানে উন্নীত করার নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে হয় সংগঠককে।

৭. সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ

কোন সংগঠনের পরিকল্পনা তৈরি হয় সেই সংগঠনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য। অর্থাৎ পরিকল্পনার ভিত্তি হচ্ছে সংগঠনের স্থায়ী কর্মসূচী। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব সংগঠককেই পালন করতে হয়। তার পর সেটি সংশ্লিষ্ট ফোরামে পেশ করতে হয় অনুমোদনের জন্য।

পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় কর্মী সংখ্যা, কর্মীদের মান, সংগঠনের আর্থিক সংগতি, শুভাকাঙ্খীদের আর্থিক সহযোগিতার সম্ভাবনা, সংগঠনের প্রভাব বলয়, পরিবেশ-পরিস্থিতি, বৈরী শক্তিগুলোর শক্তি ও কর্মকৌশল, সামগ্রিকভাবে সমাজ পরিবেশ, সংগঠনের তৎপরতার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া, সংগঠনের কর্মধারা নির্ধারণে বর্তমান সময়ের দাবি ইত্যাদি সামনে রাখতে হয়। পরিকল্পনা প্রণয়ন কালে এই বিষয়গুলো সামনে না রাখলে পরিকল্পনা একপেশে হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। আর সবগুলো দিক বিবেচনা করে পরিকল্পনা রচিত হলে তা বাস্তবধর্মী ও সময়োপযোগী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। একটি বাস্তবধর্মী ও সময়োপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়নের যোগ্যতা একজন সংগঠকের খুবই বড়ো একটি যোগ্যতা।

৮. জরুরী পরিস্থিতিতে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সংগঠনের কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় অশান্ত ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতি সংগঠনের স্বাভাবিক গতিধারা দারুণভাবে প্রভাবিত করে। আবার এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে যা সংগঠনের জন্য বিপজ্জনক। এই ধরনের পরিস্থিতি স্থায়ী কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা দ্বারা মুকাবিলা করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলেই সংগঠককে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এই ক্ষেত্রে সংগঠকের কর্তব্য হচ্ছে, উদ্ভূত পরিস্থিতির ত্বরিত মূল্যায়নের পর ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জনশক্তিকে তা যথাশীঘ্র জানিয়ে দেয়া। জরুরী পরিস্থিতিতে অবিলম্বে করণীয় নির্ধারণ করার যোগ্যতাও সংগঠকের অতি বড়ো একটি যোগ্যতা।

৯. পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

কোন বিষয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ লোক ব্যাপক আলোচনার পর কোন সিদ্ধান্ত নিলে এতে ভুলের আশংকা কম থাকে। তাই একজন বিজ্ঞ সংগঠক কখনো একা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না।

যতো বেশী সম্ভব লোকদের মতামত যাচাই করে তিনি করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংগঠকের জন্য একটি রক্ষাকবচ। একজন যোগ্য সংগঠক তা কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারেন না।

১০. পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কর্মী পরিচালনা

সংগঠক কেবল পরিকল্পনা গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হবেন না। তিনি গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গোটা কর্মী বাহিনীকে কাজে লাগাবেন। এই জন্য তিনি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কাজগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে কর্মীদেরকে ওয়াকিফহাল করে তুলবেন, প্রত্যেকের করণীয় বিষয়গুলো চিহ্নিত করে দেবেন এবং তা আঞ্জাম দেয়ার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন। কর্মীদেরকে ভালোভাবে পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেয়া এবং পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য তাদেরকে পাগলপারা করে তুলতে পারা সংগঠকের একটি বড়ো কৃতিত্ব।

১১. সঠিক ব্যক্তিদের বাছাই করে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ

সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের কাজ রয়েছে। সেইগুলো এক ব্যক্তির পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই সংগঠককে একটি টিম গড়ে তুলতে হয়।

বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর অর্পণ করতে হয় বিভিন্ন বিভাগের কাজ। বিভিন্ন কাজের জন্য লোক বাছাই করার ক্ষেত্রে সংগঠককে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সঠিক মিজাজ ও সঠিক মানের লোক বাছাই না হলে ম্যাল এডজাস্টমেন্ট সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য। অথচ কাউকে কোন পদে নিযুক্ত করা যতো সহজ, পদচ্যুত করা ততোখানি সহজ নয়। অপসারণকে সহজে মেনে নেয়ার মতো বাহাদুর ব্যক্তি কমই দেখা যায়। ফলে জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাই নিযুক্তির আগেই সংগঠককে বারবার ভাবতে হবে, ব্যক্তি চয়নের যথার্থতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে হবে। ভেবে চিন্তে, জেনে শুনে এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে লোক নিয়োগ করা একজন বিচক্ষণ সংগঠকের একটি বিশেষ যোগ্যতা।

১২. সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ

সংগঠনের সুগঠিত কার্যক্রম ক্রমশঃ শিকড় পর্যায়ে (গ্রাসরুট লেভেল) নিয়ে যাবার অবিরাম প্রচেষ্টা চালাবেন সংগঠক। অধস্তন স্তরে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা সম্পন্ন লোক হলেই তিনি সেই স্তরে সংগঠন সম্প্রসারিত করে নেবেন। এইভাবে একটি নেটওয়ার্ক নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। সঠিকমান সংরক্ষণ করে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে শিকড় পর্যায়ে সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটানো যোগ্য সংগঠকের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব।

১৩. কাজের তত্ত্বাবধান

কাজের পরিকল্পনা তৈরি করে তা কর্মীদেরকে বুঝিয়ে দেয়ার পর একজন যোগ্য সংগঠক নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকবেন না। তিনি নানাভাবে জনশক্তির কর্মতৎপরতার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। বিশেষভাবে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কাজের খোঁজ খবর নেবেন। কাজের ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সেইদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন। এইভাবে কাজের তত্ত্বাবধান করাকে একজন যোগ্য সংগঠক তাঁর নিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করবেন।

১৪. প্রেরণাদায়ক বক্তৃতা-ভাষণ

একজন যোগ্য সংগঠককে অবশ্যই সুবক্তা হতে হবে। বক্তৃতা-ভাষণের মাধ্যমেই তিনি আদর্শের বিভিন্ন দিক, আন্দোলনের গুরুত্ব এবং সংগঠনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য জনসমষ্টির সামনে তুলে ধরবেন। তাঁর বক্তৃতার ভাষা হতে হবে সহজবোধ্য। এতে থাকতে হবে বলিষ্ঠতা এবং কর্মীদের উদ্দীপিত করার ক্ষমতা। আকর্ষণীয় ও প্রেরণাদায়ক বক্তৃতা দানের যোগ্যতাও একটি বড়ো রকমের যোগ্যতা।

১৫. স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে বক্তব্য পেশ

একজন যোগ্য সংগঠক বক্তব্য পেশ করার আগে ভালোভাবে ভেবে দেখবেন যে যেইস্থানে তিনি কথা বলছেন সেইস্থানে কোন্ কথাগুলোর ওপর গুরুত্ব দেয়া উচিত, তিনি যেই কথাগুলো বলছেন সেইগুলো সময়োপযোগী কিনা এবং তিনি যাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলছেন তাদের সমঝ শক্তি, ধারণ শক্তি কতখানি। শ্রোতাদের বয়স, শিক্ষার মান, সাংগঠনিক জীবনের বয়স ইত্যাদি বিষয়ের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। একজন বিচক্ষণ সংগঠক কখনো স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করে বক্তব্য রাখেন না।

১৬. সাংগঠনিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ

প্রত্যেকটি সংগঠনেরই নিজস্ব কিছু আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম থাকে। সংগঠনের স্বকীয়তা সংরক্ষণের প্রয়োজনেই এইসব কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখা প্রয়োজন। যেমন ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখা, সাংগঠনিক মিটিং করা এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠান। আবার প্রত্যেকটি সংগঠনেরই নিজস্ব কর্মনীতি, কর্মসূচী, কর্মপদ্ধতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি ইত্যাদি থাকে। সংগঠনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের তাকিদেই এইগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা প্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে সবসময় সজাগ থাকা সংগঠকের কাজ। নতুনভাবে যারা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তাদের সামনেও এই বৈশিষ্ট্যগুলোর গুরুত্ব সঠিকভাবে তুলে ধরা এবং তাদেরকে এইগুলোর নিশানবরদাররূপে গড়ে তোলা সংগঠকের অন্যতম কর্তব্য।

১৭. আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

একটি সংগঠনের থাকে নানামুখী কাজ। এইসব কাজ সুসম্পন্ন করতে হলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। সংগঠনের জনশক্তিকে অধিক পরিমাণে আর্থিক কুরবানী করতে উদ্বুদ্ধ করবেন সংগঠক। শুধু সংগঠনের কর্মীদের অর্থদানের ওপর নির্ভর না করে শুভাকাঙ্খীদের কাছে বিভিন্ন কাজের প্রকল্প পেশ করে তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সংগঠকেরই কাজ। সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তিদের সাথে সংগঠকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। সংগঠনের আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে একজন আদর্শ সংগঠক ব্যক্তিগতভাবেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

১৮. শৃঙ্খলা সংরক্ষণ

শক্তিশালী সংগঠন মানেই সুশৃঙ্খল সংগঠন। আর শৃঙ্খলার মূল উৎপাদন হচ্ছে আনুগত্য। আনুগত্য সম্পর্কে আল-কুরআন এবং আল-হাদীস যেইসব পথ নির্দেশ পেশ করেছে সেইগুলো সম্পর্কে কর্মী বাহিনীকে ওয়াকিফহাল করে তোলা এবং এই বিষয়ে কর্মীদেরকে সদাজাগ্রত রাখা সংগঠকেরই কাজ।

আনুগত্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্যই সংগঠনে থাকে গঠনতন্ত্র বা সংবিধান। গঠনতন্ত্র সঠিকভাবে মেনে চলার ক্ষেত্রে কোন কর্মীর শৈথিল্য প্রকাশ পেলে অবিলম্বে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে এবং তাকে সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। পর্যাপ্ত প্রচেষ্টার পরও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সংশোধিত না হলে তার বিরুদ্ধে সাংবিধানিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

গঠনতন্ত্রের আনুগত্য করে না এমন ব্যক্তির প্রতি নমনীয় আচরণ করা হলে আনুগত্যহীনতাকেই উৎসাহিত করা হবে। এতে করে আনুগত্যহীনতার ব্যাধি সংক্রমিত হয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করার আশংকা রয়েছে। তাতে সংগঠনের শৃঙ্খলা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। তাই সংশোধনের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানোর পর সংগঠনের স্বার্থেই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে একজন যোগ্য সংগঠক কুণ্ঠিত হবেন না।

১৯. কর্মীদের বিভিন্নমুখী প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ

সংগঠনের কর্মীরা এক ধরনের কাঁচামাল। এদের মাঝে সুপ্ত থাকে অনেক সম্ভাবনা। কর্মীদেরকে ভালো সংগঠক, ভালো লেখক, ভালো বক্তা, ভালো সমাজকর্মী এবং ভালো জননেতারূপে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। তাছাড়া বিভিন্ন টেকনিকেল প্রশিক্ষণও যেমন, কম্পিউটার পরিচালনা, মোটর ড্রাইভিং ইত্যাদি তাদেরকে দেবার সুযোগ করে দেয়া প্রয়োজন। আধুনিক সমাজের এই ধরনের টেকনিকেল প্রশিক্ষণ কর্মীদেরকে ব্যাপকতর দক্ষতার অধিকারী করে তোলে। কর্মীদের নানামুখী প্রতিভা বিকাশের কর্মকৌশল উদ্ভাবন করা সংগঠকেরই কাজ।

২০. সুদূর প্রসারী চিন্তা নিয়ে প্রতিভাবান কর্মীদের ব্যবহার

প্রতিভাবান কর্মীরা সংগঠনের নিকট আল্লাহর এক অতি মূল্যবান আমানাত। এদের সঠিক ব্যবহার আমানাতদারীরই দাবি। এদের সঠিক ব্যবহার না হওয়া আমানাতদারীর খেলাফ কাজ।

সংগঠক ভালোভাবে কর্মীদের স্টাডি করবেন। কারা ময়দানের কাজে বেশি উপযুক্ত হবে তা বুঝে তাদেরকে চিহ্নিত করবেন। একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনার জন্য উন্নত মানের রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, প্রশাসক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, আইনবিদ, সাহিত্যিক, কূটনীতিবিদ, বিজ্ঞানী ইত্যাদি প্রয়োজন। একজন সংগঠককে বুঝতে হবে তাঁর কর্মী বাহিনীর প্রতিভাবান ব্যক্তিদের কে কোন্ ময়দানের জন্য বেশি উপযুক্ত। যারা যেই ময়দানের উপযুক্ত তাদেরকে সেই ময়দানে বিশেষজ্ঞ হবার সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। একজন বিজ্ঞ সংগঠকই কেবল এই লক্ষ্যে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

২১. কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করে দ্রুত অগ্রসরমান কর্মীদের বাছাইকরণ

আপন দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে পরিকল্পনার আলোকে ময়দানে কাজ করতে থাকলেও কর্মীদের সকলের কাজের মান এক হয় না। দেখা যাবে কোন কোন কর্মী যেনতেনভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। আবার কোন কোন কর্মী কাজ করছে খুবই সুন্দরভাবে।

সুন্দরভাবে যারা কাজ করছে তাদের মাঝেও দু'ধরনের কর্মী দেখা যায়। এদের একাংশ কাজটা তো সুন্দরভাবে করছে, তবে সময় নিচ্ছে বেশী। অপরাংশ কাজটা সুন্দরভাবে করতে গিয়েও বেশি সময় নিচ্ছে না। বুঝতে হবে, এরা অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি। এদের দ্বারা বেশি পরিমাণে কাজ করিয়ে নেয়া সম্ভব।

কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করলে আরো দেখা যাবে যে কর্মীদের অনেকেই ভালো কর্মী বটে, তবে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা তাদের নেই। আবার অনেকেই এমন আছে যারা নিজেও ভালোভাবে কাজ সম্পাদন করে, তদুপরি অন্যকে দিয়েও কাজ করিয়ে নেয়ার যোগ্যতা রাখে। বুঝতে হবে, নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা এদের মাঝে রয়েছে।

যোগ্য সংগঠকের কাজ হচ্ছে কর্মীদের মধ্য থেকে যাদের সমঝ শক্তি ও কর্মশক্তি বেশি তাদেরকে আলাদা তালিকাভুক্ত করে নেয়া।

২২. বাছাই করা কর্মীদের ব্যাপকতর প্রশিক্ষণ

সম্ভাবনাময় কর্মীদের তালিকা তৈরি করাই যথেষ্ট নয়। এদের জন্য ব্যাপকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আদর্শ, আন্দোলন ও সংগঠনের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কেও তাদেরকে ওয়াকিফহাল করে তুলতে হবে। আদর্শ, আন্দোলন ও সংগঠনের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা তাদের মাঝে বিকশিত করতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আঞ্জাম দিতে পারেন একজন দূর দৃষ্টি সম্পন্ন সংগঠক।

২৩. পারস্পরিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি

কর্মীদের মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে না উঠলে কোন সংগঠনকে শক্তিধর সংগঠন বলা চলে না। ইসলামী সংগঠনের কর্মীদেরকে সিসাঢালা প্রাচীরের মতো মজবুত হতে হবে, এটাই আল্লাহর দাবি। এর অর্থ হচ্ছে, এই সংগঠনের কর্মীগণ একে অপরের প্রতি গভীর মতত্ববোধ অনুভব করবে, একে অপরের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করবে।

এই ধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কর্মীদের মাঝে এক বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ হওয়া প্রয়োজন। একে অপরের ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখা, একে অপরের দোষের চেয়ে গুণের দিকে বেশি তাকানো, কোন অবস্থাতেই একে অপরের প্রতি রুষ্ট না হওয়া এবং একে অপরের গীবাত না করা– পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলার বুনিয়াদ। এই বুনিয়াদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হয় সংগঠককেই।

২৪. নিষ্ক্রিয়তার প্রতিকার

কোন কারণে মনে খটকা সৃষ্টি হওয়া, কারো আচরণে রুষ্ট হওয়া, কোন প্রপাগাণ্ডায় প্রভাবিত হওয়া, পরিস্থিতির ভয়াবহতায় ভীত হওয়া, কোন অবাঞ্ছিত ঘটনায় ব্যথিত হওয়া, নিজের জীবনে কোন অপরাধ ঘটে যাওয়া, ব্যক্তিগত জীবনে কোন বড়ো রকমের সমস্যা সৃষ্টি হওয়া– এই ধরনের কোন কারণে একজন কর্মী নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। সংগঠক কোন কর্মীর এমন অবস্থার কথা জানতে পেলেই শিগগির তার সাথে দেখা ও আলাপ করে আসল কারণটি চিহ্নিত করবেন এবং আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে বক্তব্য রেখে তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাবেন।

২৫. স্থবিরতার প্রতিরোধ

সংগঠনের কোন স্তরে স্থবিরতা আসতে পারে নানা কারণে।

সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণে সংগঠকের অপারগতা, কর্মী সভাগুলোতে প্রাণবন্ত ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পরিবেশিত না হওয়া, দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের রূঢ় আচরণ, দুশমনদের পরিচালিত উৎপীড়নে ধৈর্যচ্যুতি– এই ধরনের নানা কারণে একই সময় বেশি সংখ্যক কর্মী কর্মোদ্যম হারিয়ে ফেললে সংগঠন বা সংগঠনের অংশ বিশেষ স্থবিরতার শিকার হয়। এতে করে সংগঠন বেঁচে থাকলেও অগ্রগতি থেমে যায়।

সংগঠনে এমন কোন অবস্থার সূত্রপাত হচ্ছে কিনা যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে স্থবিরতা, সেই সম্পর্কে সংগঠককে সদা সচেতন থাকতে হবে। এই ধরনের কোন কিছুর লক্ষণ প্রকাশ পেলেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সংগঠনের যাবতীয় অনুষ্ঠান এবং বক্তব্য যাতে আকর্ষণীয় হয় তা নিশ্চিত করা যোগ্য সংগঠকেরই কাজ।

২৬. বিভিন্ন কাজের ভারসাম্য সংরক্ষণ

সংগঠনের আদর্শিক কনসেপ্টগুলো সাধারণের কাছে ছড়িয়ে দেবার কাজ, সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটানোর কাজ, জনশক্তির মানোন্নয়নের কাজ, সমাজ সেবা ও সংস্কারমূলক কাজ, সংগঠনের গণ ভিত্তি রচনার কাজ, জনগণের নেতৃত্ব দানের কাজ– এই ধরনের বহুমুখী কাজ একটি সংগঠনকে আঞ্জাম দিতে হয়। এই কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য পুরো জনশক্তিকে মাঠে ময়দানে নিয়োজিত করতে হয়। সংগঠক লক্ষ্য রাখবেন যাতে এক প্রকারের কাজের আধিক্য অপরাপর কাজগুলোকে গুরুত্বহীন না করে ফেলে। কোন এক সময় কোন এক ধরনের কাজ বেশি গুরুত্ব পেয়ে যাওয়াতে অপর কোন একটি কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে দেখলে পরবর্তী সময়ে সেই কাজটির ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। সামগ্রিকভাবে কাজের ভারসাম্য রক্ষা করা একজন সুযোগ্য সংগঠকের পক্ষেই সম্ভব।

২৭. আমানাত সংরক্ষণ

একটি সংগঠনের থাকে তহবিল। থাকে অনেক আসবাব-পত্র, অফিস ভবন ইত্যাদি। এইগুলো সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগঠকের কাছে গচ্ছিত থাকে। এইগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং সঠিক ব্যয়-ব্যবহারেরই নাম আমানাতদারী। সংগঠক কোন অবস্থাতেই সংগঠনের অর্থ ও সম্পদ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করে ফেলবেন না। সংগঠনের অর্থ বা সম্পদ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয়-ব্যবহার করলে একজন সংগঠক কিছুতেই কর্মীদের শ্রদ্ধাভাজন থাকতে পারেন না। একজন যোগ্য সংগঠক আমানাত সংরক্ষণে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভূমিকা পালন করে থাকেন।

২৮. সঠিকভাবে রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ

একটি সংগঠনের অনেক জরুরী কাগজপত্র, ফাইল ও রেজিষ্টার থাকে। এইগুলোকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা খুবই জরুরী। প্রত্যেকটি বিষয় সংক্রান্ত

স্বতন্ত্র ফাইল, প্রত্যেকটি ফাইলে নির্দিষ্ট নাম্বার এবং ফাইলগুলোর একটি ইনডেক্স্ থাকা প্রয়োজন।

ফাইলগুলো নির্দিষ্ট এবং নিরাপদ স্থানে সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউ এইগুলো নাড়াচাড়া না করতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে প্রতিটি কাগজ সঠিক ফাইলে যায়, অন্য ফাইলে নয়।

এইভাবে ফাইল মেনটেইন করা হলে কাগজপত্র সঠিকভাবে হিফাযত হয়। আর প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র বিনা মেহনতে এবং সময় খরচ না করে বের করা সম্ভব হয়। সুবিন্যস্তভাবে রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করাটাও একজন সুযোগ্য সংগঠকের অন্যতম বিশেষ গুণ।

২৯. সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ

সংগঠনের প্রয়োজনে সংগঠকই প্রধানতঃ অর্থ ব্যয় করে থাকেন। ক্যাশিয়ার বা বাইতুলমাল বিভাগের সচিব তহবিল সংরক্ষণ করে। সে নিজের সিদ্ধান্তে তহবিলের অর্থ ব্যয় করার অধিকারী নয়। অর্থ ব্যয়ের নির্দেশ আসবে সংগঠকের কাছ থেকে। সেই নির্দেশ লিখিতভাবে আসাই উত্তম। সেই নির্দেশ মুতাবিক ক্যাশিয়ার তার কাস্টোডি থেকে অর্থ হস্তান্তর করবে লিখিত ভাউচারের বিনিময়ে। সংগঠনের তহবিলে কোন অর্থ আসবে না রসিদে এন্ট্রি না হয়ে। তেমনি ভাউচার ছাড়া কোন অর্থ ব্যয় হবে না। ক্যাশিয়ার অর্থ ব্যয়ের একটি টালি সংরক্ষণ করবে। আর একাউনট্যান্ট ক্যাশ বই, লেজার বই এবং ষ্টেটমেন্ট অব একাউন্টস ক্রমাগতভাবে লিখে যেতে থাকবে আধুনিক হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির চাহিদা পূরণ করে। একই ব্যক্তি অর্থ আদায় করা, অর্থ ব্যয় করা এবং আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। এতে হিসাব সংরক্ষণে গোলমাল দেখা দিতে বাধ্য।

একজন বিজ্ঞ সংগঠক কিছুতেই এই গোলমালে পড়ে নিজের ইমেজ বিনষ্ট করতে তৈরি হতে পারেন না। তাই তাঁকে দেখা যাবে এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন।

৩০. বৈরী শক্তিগুলোর মুকাবিলার জন্য বিজ্ঞানসম্মত পন্থা উদ্ভাবন

বৈরী সংগঠনগুলো ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের চরিত্র হনন এবং সংগঠন সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তির ধুম্রজাল সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে থাকে।

এই প্রচার যে মিথ্যাশ্রয়ী তা সঠিকভাবে জনগণকে জানিয়ে দেয়ার পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে সংগঠককে। ইতিহাস সাক্ষী, বৈরী শক্তিগুলো যখন দেখে যে তাদের

মিথ্যা প্রচারণাও শেষ রক্ষা করতে পারছে না তখন তারা ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের ওপর দৈহিক হামলা চালাতে শুরু করে।

এমতাবস্থায় সঠিক কর্ম কৌশল উদ্ভাবন করা সংগঠকেরই দায়িত্ব।

বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সাধারণতঃ যুলম বিরোধী। সেই কারণে মাযলুমের প্রতি তাঁরা থাকে সহানুভূতিশীল। যালিমদেরকে চিহ্নিত করে তাদের ঘৃণ্য তৎপরতা উন্মুক্ত করে পেশ করতে হবে জনগণের কাছে। যালিমদের যুলমের কাহিনী বা বিবরণ সঠিকভাবে জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারলে বিবেকবান জনগণ তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হবে। এইভাবে যালিমগণ হবে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। মনে রাখা দরকার যে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন যালিমদের সন্ত্রাসী তৎপরতা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না। জনগণের প্রবল প্রতিরোধের মুখে শেষাবধি তা ভণ্ডুল হয়ে যায়।

কি কি পন্থায় যালিমদেরকে এক্সপোজ করে জনগণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা অর্জন করা যায় তা নির্ণয় করে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করা একজন যোগ্য সংগঠকের কাজ।

৩১. গণভিত্তি রচনা

যেহেতু এই যুগে দুনিয়ায় সামগ্রিকভাবে ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারাই প্রায় সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, সেহেতু দুনিয়ার কোন অঞ্চলে ইসলামী বিপ্লব ঘটাতে হলে, সেই ভূ-খণ্ডের জনগণের নীরব সমর্থন যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন তাদের সক্রিয় সমর্থনের।

কোন ভূ-খণ্ডের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তখনই ইসলামী সংগঠনের সক্রিয় সমর্থকে পরিণত হতে পারে যখন তারা উপলব্ধি করবে যে এই সংগঠন যা বলছে তা তাদের মনেরই কথা, এই সংগঠন যা করতে চায় তা করা গেলে তাদেরই কল্যাণ হবে এবং এই সংগঠনের দেখানো পথই সমস্যা সমাধানের একমাত্র নির্ভুল পথ।

এই উপলব্ধির পরও জনগণ সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য এগিয়ে আসবে না, এটা স্বাভাবিক নয়। নিজেদের মঙ্গলের পথ নির্ভুলভাবে চিনতে পারার পরও তারা এই পথের পথিকদেরকে আপন ভাববে না বা তাদের সাথে একাত্ম হবে না, এটা হতে পারে না। এমতাবস্থায় তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই সংগঠনের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াবে।

এমন একটি অবস্থা সৃষ্টির নামই গণ ভিত্তি রচনা। কিভাবে এই অবস্থা সৃষ্টি করা যায় তা নির্ণয় ও কার্যকর করা যোগ্য সংগঠকেরই কাজ।

৩২. অধঃস্তন ব্যক্তি ও অধঃস্তন সংগঠন থেকে কাজের রিপোর্ট আদায়

অধঃস্তন ব্যক্তি ও অধঃস্তন সংগঠনের ওপর অর্পিত স্থায়ী বা কোন সাময়িক কাজের রিপোর্ট আদায় করবেন সংগঠক। তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংগঠনের কাজের রিপোর্ট তাঁর হাতে এলো কিনা। যদি কোথাও থেকে সঠিক সময়ে রিপোর্ট এসে পৌঁছে না থাকে তাহলে সংগে সংগে রিমাইন্ডার দিতে হবে। প্রথম রিমাইন্ডারের পর পর রিপোর্ট না এলে আবারো রিমাইন্ডার দিতে হবে। অর্থাৎ রিপোর্ট তাঁকে আদায় করতেই হবে।

৩৩. রিপোর্টের আলোকে কাজের পর্যালোচনা

অধঃস্তন সংগঠন থেকে রিপোর্ট আদায় তখনই অর্থবহ হতে পারে যখন সংগঠক আদায়কৃত রিপোর্ট পড়বেন, কাজের অগ্রগতি বা অধোগতি নির্ণয় করবেন এবং সেই মুতাবিক অধঃস্তন সংগঠনকে লিখিত পর্যালোচনা ও পরামর্শ পাঠাবেন।

নিয়মিতভাবে কাজের এরূপ মূল্যায়ন হতে থাকলে অধঃস্তন সংগঠন উপকৃত হয় এবং সহজেই পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ এইভাবে রিপোর্ট পর্যালোচনার মাধ্যমে সংগঠক অধঃস্তন ব্যক্তি বা সংগঠনের কাজ উন্নততর করার ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করতে পারেন।

৩৪. কুণ্ঠাহীন জবাবদিহি

জবাবদিহি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যিনি কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য নিযুক্ত হন, তাঁকে নিয়োগকারী ব্যক্তিদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। দুনিয়ার সর্বত্রই এই নিয়ম প্রচলিত রয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে এই পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কতিপয় কর্তব্য পালনের জন্য প্রেরণ করেছেন। এই কর্তব্য পালন সম্পর্কে তিনি এক নির্দিষ্ট দিনে সকল মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন বলেও জানিয়েছেন। অর্থাৎ সেইদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃত কর্মের জন্য আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে।

কোন সংগঠনের সংগঠক নিরংকুশ স্বাধীন কোন ব্যক্তিত্ব নন। যারা তাঁকে নির্বাচিত বা নিযুক্ত করেছে তিনি তাদের প্রশ্নের জবাব দান এবং তাঁর দায়িত্ব পালন ও অর্থ-সম্পদ ব্যয়-ব্যবহার সম্পর্কে তাঁদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। একজন আদর্শ সংগঠক কুণ্ঠাহীনভাবেই এই জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকেন।

৩৫. যোগ্য উত্তরসূরীসৃষ্টি

আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান সংগঠক। কিন্তু কোন সংগঠকই অমর নন। তদুপরি জীবদ্দশাতেও একজন সংগঠকের স্থানান্তরিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তাঁর স্থানান্তরিত হওয়া অথবা ইনতিকালের পর যদি শূন্য স্থান পূর্ণ করার মতো যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া না যায় তা সংগঠনের জন্য মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনে। সংগঠন যাতে এই ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন না হয় তার জন্য সংগঠককে পূর্বাহ্নেই পরিকল্পিতভাবে বিকল্প নেতৃত্বের একটি গ্রুপ তৈরি করতে হয়। এই ক্ষেত্রে বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ (সা) তো অনন্য উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন। তিনি নেতৃত্ব দেবার মতো যোগ্য বেশ কয়েকজন ব্যক্তি গড়ে তুলেছিলেন যাঁরা তাঁর ইনতিকালের পর একের পর এক সফলভাবে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব প্রদান করেছেন।

নিঃসন্দেহে যোগ্য উত্তরসূরী সৃষ্টি একজন সংগঠকের অতি বড়ো একটি কৃতিত্ব।

কর্মীদের প্রতি নেতৃত্বের আচরণ

নেতৃত্ব এবং কর্মীদের মিলিত প্রয়াসের ওপর ভিত্তি করেই আন্দোলনের কাজ সামনে এগুতে থাকে। নেতৃত্ব এবং কর্মীদের মাঝে সুসম্পর্ক থাকলে কাজ স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে অগ্রসর হয়। এই সম্পর্ক কাঙ্খিত মানে না থাকলে কাজের গতি স্বচ্ছন্দ থাকে না বরং মাঝে মধ্যেই এর গতি ব্যাহত হয়। এইভাবে হোঁচট খেতে খেতে এক পর্যায়ে এসে কাজের গতি একেবারে মন্থর হয়ে পড়ে।

কাজের সুন্দর ও স্বাভাবিক অগ্রগতির জন্য নেতৃত্ব এবং কর্মীদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আর এই সুসম্পর্ক নির্ভর করে একের প্রতি অপরের বাঞ্ছিত আচরণের ওপর। এই নিবন্ধে আমরা কর্মীদের প্রতি নেতৃত্বের কাঙ্খিত আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১. নেতৃত্ব হবেন কর্মীদের জন্য প্রেরণার উৎস

একটি আদর্শিক আন্দোলনের কর্মীদেরকে নানামুখী কাজ-কর্ম করতে হয়। এইসব কাজ যেমনি দাবি করে সময়, তেমনি পরিশ্রম।

আবার আদর্শিক আন্দোলনের পথ মোটেই ফুলবিছানো নয়। এই পথে আছে নানা বাধা-বিপত্তি। তদুপরি কর্মীদের অনেকেরই বড়ো বড়ো ব্যক্তিগত সমস্যা থাকে যা তাদেরকে হতোদ্যম করে ফেলতে পারে।

যাবতীয় কাঠিন্য বরদাশত এবং সমস্যা ও বাধা উপেক্ষা করে আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাবার মন-মানসিকতা সজীব রাখার জন্য নেতৃত্বকে ভূমিকা পালন করতে হয়। আদর্শিক জ্ঞান বিতরণ, সদালাপ, অমায়িক ব্যবহার এবং উন্নত চরিত্রের প্রভাব দ্বারাই কেবল নেতৃত্ব এই ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে পারেন।

২. নেতৃত্ব বিনম্র ভাষায় নির্দেশ দেবেন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের ওপর নেতৃত্বের নির্দেশ পালনকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। আল্লাহর এই বিধান সম্পর্কে

অবহিত প্রত্যেক কর্মী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নেতৃত্বের নির্দেশ পালন করবেন, এটাই স্বাভাবিক।

নেতৃত্ব কর্মীদেরকে বিভিন্ন কাজের নির্দেশ অবশ্যই দেবেন। তবে নির্দেশ প্রদানের ভাব-ভঙ্গি ও ভাষা মোটেই রুক্ষ হওয়া উচিত নয়। কোন অবস্থাতেই ভদ্রতার সীমারেখা লঙ্ঘন করা উচিত নয়। নেতৃত্ব কোন একটি কাজ সম্পন্ন হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরবেন। প্রয়োজনে নেতৃত্ব বার বার কাজ বা বিষয়টির দিকে কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তিনি বা তাঁরা বলিষ্ঠভাবে তাঁর বা তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরবেন। কিন্তু নেতৃত্বকে সজাগ থাকতে হবে যাতে কোন অবস্থাতেই মেজাজ উগ্র না হয়ে পড়ে।

৩. নেতৃত্ব কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবেন

একটি সংগঠনের কর্মীগণ মেশিন নয়, মানুষ। তাদের রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। পরিবার, প্রতিবেশ ও সমাজ পরিমণ্ডলে তাদের সমস্যা থাকতে পারে। কেউ কেউ মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত থাকতে পারে। কেউ কেউ চরম দারিদ্র্যের শিকার হতে পারে।

এইসব সমস্যা কর্মীদেরকে অহর্নিশ যাতনা দিয়ে থাকে। পীড়ন করতে থাকে তাদেরকে নিদারুণভাবে। ফলে তাদের মানসিক সুস্থিরতা বিনষ্ট হয়। ব্যাহত হয় মনোযোগ। নষ্ট হয় কর্মস্পৃহা। কর্মীদের অবস্থা সম্পর্কে নেতৃবৃন্দের অবগতি থাকা চাই। এক স্তরের নেতৃত্ব সকল স্তরের কর্মীদের সমস্যা সমানভাবে অবহিত থাকবেন, এটা স্বাভাবিক নয়। তবে সামগ্রিকভাবে সংগঠনের সকল কর্মীই যাতে সংগঠনের কোন না কোন পর্যায়ের নেতৃত্বের কাছে তাদের সমস্যাদি ব্যক্ত করতে পারে এবং সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরামর্শ লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা চাই।

কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকলে নেতৃত্ব কর্ম বণ্টনের সময় ভুল করে ফেলতে পারেন। তিনি কঠিন সমস্যাপীড়িত কোন ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যাতীত কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারেন। যা কিছুতেই হওয়া উচিত নয়।

৪. নেতৃত্ব বয়স, সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষার মান ইত্যাদি বিচার করে কর্মীদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করবেন

একটি সংগঠনে থাকে নানান কাজ। কোন কাজ উচ্চ শিক্ষা দাবি করে, কোনটি তা করে না। কোন কাজ খুব দৈহিক শ্রম দাবি করে, কোনটি তা করে না। কোন কাজ দীর্ঘ সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা দাবি করে, কোনটি তা করে না।

তাই কর্ম বণ্টনের সময় কর্মীদের বয়স, সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষার মান ইত্যাদি বিচার করে যেই ব্যক্তি যেই কাজের উপযুক্ত তার ওপর সেই কাজ অর্পণ করতে হবে। এইভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে কর্ম বণ্টন করলে দেখা যাবে সঠিক ব্যক্তির ওপর সঠিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

৫. নেতৃত্ব কর্মীদের কার্য সম্পাদনে সহযোগিতা করবেন

কোন কর্মীর ওপর একটি দায়িত্ব অর্পণ করেই নেতৃত্ব নির্লিপ্ত থাকবেন না। নেতৃত্ব কর্মীকে কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সহযোগিতা প্রদান করবেন।

প্রথমেই কর্মীর ওপর অর্পিত দায়িত্বের দাবিটা কি তা তাকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার। সেই দায়িত্ব পালনের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সেই সম্পর্কেও তাকে পরামর্শ দেয়া যায়। আপন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোন কর্মী কোন জটিলতার সম্মুখীন হলে তা অতিক্রম করার উপায় বলে দিয়েও তাকে সাহায্য করা যেতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে সাময়িকভাবে কোন কর্মীকে প্রথমোক্ত কোন কর্মীর সহযোগিতার জন্য নিয়োজিত করা যেতে পারে।

৬. নেতৃত্ব কর্মীদের সাথে অনানুষ্ঠানিক আলাপ করবেন

একটি সংগঠনের থাকে নানা ধরনের ফর্মাল মিটিং। এই মিটিংগুলোতে কর্মীদের সাথে নেতৃত্বের সাক্ষাত হয় বটে, কিন্তু অন্তরঙ্গ আলাপের কোন সুযোগ থাকে না। এই মিটিংগুলোর সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকে। এর ভিত্তিতেই মিটিং শুরু হয়, কার্যক্রম সামনে অগ্রসর হয় এবং এক পর্যায়ে এসে মিটিং সমাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় মিটিংয়ে কর্মীদের সাথে নেতৃত্বের সাক্ষাত ঘটলেও তাদের সাথে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার সুযোগ মেলে না। অথচ কর্মীদের মান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ, তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তাদের মানোন্নয়নের জন্য তাদের সাথে নেতৃত্বের ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা খুবই জরুরী। তাই নেতৃত্বকে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাতকারের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করতে হবে।

৭. নেতৃত্ব কর্মীদের প্রতি কোমলতা-উদারতা-ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করবেন

কর্মীগণ সংগঠনের লক্ষ্য হাসিলের জন্য আন্তরিকভাবেই প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। অবশ্য কারো মনে যদি কোন কারণে বক্রতা সৃষ্টি হয়ে থাকে ভিন্ন কথা। কর্তব্য পালনের মান সকলের একই রকম হয় না। যোগ্যতা অনুসারে এর তারতম্য হবেই।

তাছাড়া কার্য সম্পাদনকালে কারো কারো ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাবেই। নেতৃত্বের কর্তব্য হচ্ছে কর্মীদের সেইসব ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। ভুল মুক্ত হয়ে কাজ করার জন্য তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কাজের মান উন্নত করার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

আচরণের ক্ষেত্রেও সকল কর্মী একই মানের হবার কথা নয়। কারো আচরণ খুবই সুন্দর। আবার কারো আচরণে অনাকাংখিত কিছু প্রকাশ পেতে পারে। অনাকাংখিত কিছু ঘটলে তা শুধরাবার প্রয়াস চালাতে হবে। বার বার সেইদিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

কোন কোন কর্মী কোন এক সময় শৃংখলা বিরোধী আচরণও করে ফেলতে পারে। সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। তাদের বিবেককে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস চালাতে হবে। তারা যদি ভুল স্বীকার করে এবং ভবিষ্যতে আর কখনো এমন অবাঞ্ছিত আচরণ করবে না বলে অঙ্গীকার করে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে হবে। অবশ্য ভুল স্বীকারের পরিবর্তে তারা যদি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে থাকে তাহলে নেতৃত্বকে শৃংখলার স্বার্থে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সংগঠনের সুস্থতার জন্য এই ধরনের পদক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই পদক্ষেপকে অবশ্যই ব্যতিক্রম গণ্য করতে হবে। সামগ্রিকভাবে নেতৃত্ব কর্মীদের প্রতি কোমল আচরণ করবেন, তাদের প্রতি উদার হবেন এবং যত বেশি সম্ভব তাদেরকে ক্ষমাশীলতার দৃষ্টিতে দেখবেন, এটাই ইসলামের দাবি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই ইসলামী আন্দোলনের মূল নেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা) নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

“তোমার অনুসারী মুমিনদের প্রতি নম্র ব্যবহার কর।” (সূরা আশ্ শূয়ারা : ২১৫)

মহান আল্লাহ বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ.

“নম্রতা ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, মা'রূফ কাজের উপদেশ দিতে থাক এবং মূর্খ লোকদের সাথে জড়িয়ে পড়ো না।” (সূরা আল আ'রাফ : ১৯৯)

আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

"যেই ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করলো এবং ক্ষমা করলো– নিশ্চয়ই তা উচ্চ মানের সাহসী কাজের অন্যতম। (সূরা আশ শূরা : ৪৩)

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার ওপর ওহী পাঠিয়েছেন : তোমরা পরস্পর বিনয়-নম্রতার আচরণ কর যেই পর্যন্ত না কেউ কারো ওপর গৌরব করে ও অপরের ওপর বাড়াবাড়ি করে।" (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল (সা) অন্যত্র বলেন : "দান দ্বারা সম্পদ কমে না। ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ সম্মান বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই করেন না। আর যেই ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (সহীহ মুসলিম)

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, "আল্লাহ কোমল। তিনি কোমলতা ভালোবাসেন। তিনি কোমলতা দ্বারা ঐ জিনিস দান করেন যা কঠোরতা দ্বারা দেন না। কোমলতা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারাই তিনি তা দেন না।" (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, "যেই জিনিসে কোমলতা থাকে কোমলতা সেটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর যেই জিনিস থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেয়া হয় সেটা ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়।" (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল (সা) অন্যত্র বলেছেন, "যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে সব রকমের কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে।" (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল (সা) আরো বলেন, "জাহান্নামের আগুন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হারাম যে লোকদের সাথে থাকে, যে কোমল মন, নরম মিজাজ ও বিনম্র স্বভাব বিশিষ্ট।" (জামিউত্ তিরযিমী)

ক্ষমাশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মহান আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

"তাদের বৈশিষ্ট্য : তারা রাগ হজমকারী এবং লোকদের প্রতি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বনকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিনদেরকে ভালোবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান : ১৩৪)

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, "নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল ঐ ব্যক্তি যে অধীন লোকদের প্রতি কঠোর। সতর্ক থেকো যাতে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পড়।" (সহীহ মুসলিম, সহীহুল বুখারী)

ইসলামী আন্দোলনের মূল নেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন কোমলতা, উদারতা ও ক্ষমাশীলতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর এই গুণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন তিনি, "...মুমিনদের প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (সূরা আত্ তাওবা)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص

"এটা আল্লাহর বড়োই অনুগ্রহ যে তুমি তাদের জন্য নম্র স্বভাবের লোক হয়েছো। তুমি যদি উগ্র-স্বভাব (কটুভাষী) ও কঠোর চিত্ত হতে তাহলে এসব লোক তোমার চারদিক থেকে দূরে সরে যেতো।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

আল-কুরআনের এইসব আয়াত এবং আল্লাহর রাসূলের (সা) এইসব উক্তি থেকে অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায় আল ইসলাম কোমলতা-উদারতা-ক্ষমাশীলতার ওপর কতোখানি গুরুত্ব আরোপ করেছে।

আল-কুরআন এবং আল-হাদীসের শিক্ষাকে সামনে রেখেই নেতৃত্বকে কর্মীদের সাথে বিনম্র আচরণ করতে হবে।

একটি মজবুত সংগঠনের পরিচয়

আদর্শিক ভিত্তিতে কোন ভূ-খণ্ডের সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হলে একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। বলিষ্ঠ সংগঠিত উদ্যোগ ছাড়া কায়েমী স্বার্থবাদের অকটোপাস থেকে সমাজকে মুক্ত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সেই জন্যই আদর্শিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে দীর্ঘ সময় ধরে একটি শক্তিশালী বা মজবুত সংগঠন গড়ে তোলার জন্য অহর্নিশ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কোন সংগঠন ক্রমশঃ শক্তি অর্জন করে গণ মানুষের সংগঠনে পরিণত হলেই কাংখিত পরিবর্তনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এখানে আমরা সংক্ষেপে একটি মজবুত সংগঠনের পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

১. সুযোগ্য নেতৃত্বের সমাবেশ

একটি সংগঠনের কেন্দ্র থেকে শুরু করে শিকড় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্ব দানের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিত্বের সমাবেশ প্রয়োজন। যেহেতু সংগঠনের কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব এই সকল ব্যক্তিই পালন করে থাকেন সেহেতু তাঁদের যোগ্যতার মান অনুযায়ীই সংগঠনের পরিকল্পনা প্রণীত হয় এবং তাঁদের যোগ্যতার মান অনুযায়ীই তা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

সংগঠনের যেই স্তরে বা যেই অঞ্চলে সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গ থাকেন সেই স্তরে বা সেই অঞ্চলে কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জিত হয় এবং কর্ম এলাকায় তাঁদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সংগঠনের কোন স্তরে বা কোন কর্ম এলাকায় নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দুর্বল হলে সেখানে কাজের গতি শ্লথ হয়ে পড়তে বাধ্য। শুধু তাই নয় সেখানে কাজ থমকেও দাঁড়াতে পারে। ফলে পরবর্তী স্তরে কাজ সম্প্রসারিত হওয়া অথবা সাংগঠনিক তৎপরতার প্রাণবন্যা নিম্ন পর্যায়ে পৌছানো দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়।

অতএব সংগঠনের অগ্রগতির স্বার্থে এর সকল স্তরে সুযোগ্য নেতৃবর্গের সমাবেশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এটিই হচ্ছে সাংগঠনিক মজবুতির প্রথম ও সর্ব প্রধান শর্ত।

২. নবীনদেরকে সম্পৃক্ত করার সক্ষমতা

এটা সত্য যে, প্রবীণের অভিজ্ঞতার কোন বিকল্প নেই। তেমনিভাবে এটাও সত্য যে, নবীনদের কর্মোদ্দীপনার কোন বিকল্প নেই। কাজেই একটি সংগঠনে প্রবীণ ও নবীনের সম্মিলন প্রয়োজন। যেই সংগঠন ক্রমান্বয়ে তরুণ তাজাদেরকে সংগঠনের সর্বস্তরে সম্পৃক্ত করে নিতে পারে না তা এক পর্যায়ে এসে গতিশীলতা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য।

যোগ্যতাসম্পন্ন নবীন কর্মীগণ যাতে সংগঠনে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় সেইদিকে নজর রাখা সংগঠনের সকল স্তরের নেতৃবর্গের একটি বিশেষ কর্তব্য। বস্তুতঃ কোন সংগঠনে নবীনদের বিপুল সমাবেশ ঘটলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সেই সংগঠন সাংগঠনিক মজবুতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করলো।

৩. ব্যবস্থাপনায় যোগ্য ব্যক্তিদের সমাবেশ

সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে মূল নেতৃত্ব ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগীয় দায়িত্ব পালনের জন্য অনেক লোক নিয়োগ করতে হয়। অফিস পরিচালনা, গ্রন্থাগার পরিচালনা, হিসাব রক্ষণ ইত্যাদি কাজের জন্যও বেশ কিছু লোকের প্রয়োজন। এইসব কাজের পদগুলো বাহ্যতঃ ছোট বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এইগুলোও খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদ। এইসব পদে যাঁরা থাকেন তাঁরাই মূল নেতৃত্বকে ব্যাক আপ সার্ভিস দিয়ে থাকেন। তাঁরা যদি সঠিক সময়ে এবং সঠিক মানে ব্যাক আপ সার্ভিস দিতে না পারেন তাহলে মূল নেতৃত্ব সঠিক সময়ে এবং সঠিক মানে তাঁদের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হওয়ার আশংকা রয়েছে। সেই জন্য এই পদগুলোতেও যাতে দক্ষ ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটতে পারে সেইদিকে মূল নেতৃত্বকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

'একজন কর্মী বেকার। কোথাও কর্মসংস্থান করা যাচ্ছে না। কাজেই সংগঠনের অফিসে ঢুকিয়ে দাও'-এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপনার কোন দায়িত্ব দেয়া সমীচীন নয়। বেকার কর্মীর জন্য প্রয়োজনবোধে কল্যাণ ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু তাই বলে অযোগ্য বা কমযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ব্যাক আপ সার্ভিস দেবার মতো কোন পদে কিছুতেই নিয়োগ করা উচিত নয়। সঠিক পদে সঠিক ব্যক্তির নিয়োগও একটি মজবুত সংগঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪. প্রয়োজনীয় ও উন্নততর উপকরণের সমাবেশ

দিনের পর দিন মানুষের বস্তু জ্ঞান বিস্তৃতি লাভ করছে। মানুষ জীবনকে সহজ ও গতিশীল করার জন্য নিত্য নতুন উপকরণ আবিষ্কার করছে। এইগুলোর ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে দূরতম অঞ্চলের সাথে যোগাযোগসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা মানুষ লাভ করছে। দুনিয়ার অপরাপর সংগঠন সেইগুলো ব্যবহার

করে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে আর একটি ইসলামী সংগঠন সেইগুলো ব্যবহার না করে পিছিয়ে থাকবে এটা মোটেই অভিপ্রেত নয়। টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেট, টেলেক্স, অডিও ভিডিও ইকুইপমেন্টস, ফটোষ্ট্যাট মেশিন, কম্পিউটার মেশিন, মোটর সাইকেল, মোটর গাড়ী ইত্যাদি বর্তমান কালে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় উপকরণ। প্রয়োজনের তীব্রতা সামনে রেখে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে এইগুলোর সমাবেশ ঘটাতে হবে ক্রমান্বয়ে। এইগুলোর সমাবেশ নিঃসন্দেহে একটি গতিশীল সংগঠনের পরিচয় বহন করে।

৫. শিকড় পর্যায় পর্যন্ত সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ

একটি ভূ-খণ্ডের প্রতিটি এলাকা সংগঠনের আওতাভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সংগঠনের আদর্শিক ধ্যান-ধারণা, এর দৃষ্টিভঙ্গি এবং বক্তব্য গণ-মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছাতে হলে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত এর প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন। শিকড় পর্যায় পর্যন্ত সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটানো ছাড়া এটি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

তদুপরি একটি সংগঠন তো শেষাবধি গণ-মানুষের সংগঠন হতে চায়। তাই গণ-মানুষ যতো জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সংগঠনের শাখা সেখান পর্যন্ত বিস্তৃত হতে হবে। সংগঠন গণ-মানুষের বহুমুখী সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব পালন করবে, জনগণকে সাথে নিয়েই কায়েমী স্বার্থবাদের ভিত কাঁপিয়ে তুলবে। আর সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগঠন গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত থাকতে হবে।

রাজধানী থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র সংগঠনের নেটওয়ার্ক গড়ে উঠলে ধরে নিতে হবে সংগঠন সাংগঠনিক মজবুতির আরেকটি জরুরী শর্ত পূরণ করতে পেরেছে।

৬. নেতৃত্ব ও কর্মীদের সুসম্পর্ক

কোন সংগঠনে নেতৃবৃন্দ যদি বস্ সেজে যান এবং কর্মীগণকে ভৃত্য মনে করেন তাহলে সেই সংগঠন বেশি দিন বেঁচে থাকার কথা নয়। এই ধরনের কোন সংগঠনে একজন কর্মী দুনিয়াবী কোন স্বার্থে হয়তোবা বাহ্যিকভাবে নেতৃত্বের আনুগত্য করতে পারে, কিন্তু তার অন্তরে নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকার কথা নয় এবং তার অন্তরে নেতৃত্বের প্রতি সীমাহীন ঘৃণাই বাসা বেঁধে থাকার কথা। যেই সংগঠনে নেতৃত্ব এবং কর্মীদের মধ্যকার সম্পর্কের ধরন এই, সেই সংগঠনকে মজবুত সংগঠন বলার কোন উপায় নেই।

যেই সংগঠনের নেতৃত্ব কর্মীদেরকে আন্তরিকভাবেই ভাই মনে করেন, তাদেরকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন এবং সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ান সেই সংগঠনের কর্মীবৃন্দ স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্বকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করবে, ভালোবাসবে,

অকাতরে তাঁর বা তাঁদের নির্দেশ মেনে নেবে এবং নেতৃত্বের নির্দেশে যেই কোন ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, এটাই স্বাভাবিক।

সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে এই কর্মীদের ভূমিকা ভাড়াটে কর্মীদের ভূমিকার মতো হবে না। এমতাবস্থায় সংগঠনের কাজকে তারা নিজেদেরই কাজ মনে করবে এবং সর্বোত্তমভাবে সেই কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে।

তাই নেতৃত্ব ও কর্মীদের সুসম্পর্ক সাংগঠনিক মজবুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৭. কর্মীদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক

কোন সংগঠনে বহুসংখ্যক কর্মীর সমাবেশ ঘটলেই তাকে মজবুত সংগঠন বলা যায় না যদি না সেই সংগঠনের কর্মীদের মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বিরাজ করে। পারস্পরিক সুসম্পর্ক থাকলেই এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সুখ-দুঃখের সাথী হতে পারে, নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অপরের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপরের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে পারে।

যেই সংগঠনের কর্মীগণ নিজের প্রয়োজনের ওপর অপরের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে পারে সেই সংগঠনের শক্তি অনেক।

সেই সংগঠনের কর্মীদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ থাকে না। সেই কারণেই থাকে না পরনিন্দা। আর হিংসা-বিদ্বেষ এবং পরনিন্দার অনুপস্থিতি সঠিক অর্থেই একটি সংগঠনের পরিপূর্ণ সুস্থতার লক্ষণ। কাজেই কোন সংগঠনের কর্মীদের মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বিরাজ করলে সেই সংগঠন সাংগঠনিক মজবুতির অত্যাবশ্যকীয় একটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেছে, এই কথা জোর দিয়েই বলা যায়।

৮. ভারসাম্যপূর্ণ বহুমুখী তৎপরতা

একটি সংগঠনের থাকে নানামুখী কাজ। বিশেষ করে একটি আদর্শিক সংগঠন বহু ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে কাজ করে থাকে। আদর্শিক কনসেপ্টগুলোর উপস্থাপনার মাধ্যমে চিন্তা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি, ব্যক্তির স্বকীয়তায় আমূল পরিবর্তন সাধন, সামাজিক ব্যাধি ও সমস্যাগুলো নিরসনকল্পে পরিচালিত সংস্কারধর্মী কর্মকাণ্ড এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে সৎ ব্যক্তিদের উত্থান প্রয়াস একটি বাস্তবধর্মী সংগঠনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্য পরিচালিত হয় বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড। এইসব কর্মকাণ্ডের কোন একটি দিকও না বাহুল্য, না অপ্রয়োজনীয়। এইগুলোকে সামনে রেখেই

সংগঠন কর্ম এলাকায় কর্ম তৎপরতা চালায়, সংগঠনের মাঠকর্মীরা মাঠ চষে বেড়ায়। কিন্তু এই মাঠ চষে বেড়ানোর কাজটা একপেশে হয়ে গেলেই সমস্যা। সবগুলো কাজই যদি যুগপৎভাবে সম্পাদিত হয় তবেই সোনায় সোহাগা। সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে যাতে পরিপূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা পায় সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন সংগঠনের পরিচালকবৃন্দ। কোন একটি দিককেও উপেক্ষা বা অবহেলা না করে ভারসাম্য রক্ষা করে যদি সংগঠন কর্মতৎপরতা চালাতে পারে তাহলে এই সংগঠন মজবুত সংগঠন নামে আখ্যায়িত হওয়ার দাবি করতে পারে সংগতভাবেই।

৯. আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা

একটি সংগঠনের বিভিন্নমুখী তৎপরতা পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অর্থাভাবে যদি কোন সাংগঠনিক কাজ ব্যাহত হয় এটা নিঃসন্দেহেই দুর্ভাগ্যজনক। তদুপরি এটা সাংগঠনিক দুর্বলতার পরিচায়কও বটে।

একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান এর গোটা কর্মী বাহিনীকেই দিতে হবে। এর জন্য কর্মী বাহিনীর মধ্যে অব্যাহতভাবে মটিভেশন প্রদানের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তবে কর্মী বাহিনীর বাইরেও সংগঠনের প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত ধনী ব্যক্তিদেরকে এই সংগঠনে অর্থ দানের মর্যাদা এবং প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে বুঝাতে হবে। তাহলে তাঁরাও এই সংগঠনের তহবিলে অকাতরে দান করতে এগিয়ে আসবেন বলে আশা করা যায়।

মোটকথা, অর্থাভাবে সংগঠনকে পঙ্গু করে রাখার কোন উপায় নেই। শুভাকাঙ্খীদের কাছ থেকে কোন অর্থ পাওয়া না গেলেও সংগঠনের প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করতে হবে এবং তা করতে হবে সংগঠনের কর্মীদের কাছ থেকেই। কোন সংগঠন যখন এর কর্ম এলাকায় বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান নিজেই দিতে পারে তখন একে শক্তিশালী সংগঠন গণ্য করার একটি মজবুত ভিত্তি পাওয়া যায়।

১০. কর্ম এলাকায় নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি

সংগঠন যেই ভূ-খণ্ডে বা যেই অঞ্চলে কাজ করে তাকে সেই ভূ-খণ্ড বা অঞ্চলে এর নেতৃবৃন্দ এবং কর্মী বাহিনীর ব্যাপক প্রভাব থাকা প্রয়োজন। অবশ্য এই প্রভাব এমনিতেই সৃষ্টি হয় না। সংগঠন যখন বহুমুখী তৎপরতা চালিয়ে জনগণের আস্থাভাজন হতে পারে তখনই এই প্রভাবের বিস্তৃতি ঘটে। আসলে সমাজের প্রতিটি মানুষই কল্যাণের কাঙ্গাল। তারা যখন নিশ্চিত হতে পারে যে এই

সংগঠন এবং এর নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী সত্যিকার অর্থেই তাদের কল্যাণকামী, তখন তারা এই সংগঠনের দিকে মানসিকভাবে ঝুঁকে পড়ে।

তখন তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশা জানাবার জন্য এদের কাছেই ছুটে আসে। তাদের নানাবিধ সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য এদেরই সহযোগিতা কামনা করে। এই অবস্থাতে সংগঠন যদি তাদের প্রতি অর্থবহ কোন সহযোগিতা দিতে পারে তাহলে তারা কাগজ কলমে না হলেও আন্তরিকভাবেই এই সংগঠনেরই লোক হয়ে যায়।

কর্ম এলাকায় এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হলে নির্দ্বিধায় বলা চলে যে সংগঠন একটি মজবুত সংগঠন হওয়ার অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে।

১১. বৈরী শক্তিগুলোর চক্রান্ত নস্যাৎ করার ক্ষমতা

বৈরী শক্তিগুলোর ইসলামী সংগঠনের উপস্থাপিত আদর্শের বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। কেন না যেই কোন যুক্তি-তর্কে এটাই প্রমাণিত হয় যে ইসলামই সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ। যারা এর কল্যাণকারিতা এবং সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে না তারা অন্যায়ভাবে কোমর বেঁধে এর বিরোধিতায় নেমে পড়ে। যেহেতু তারা আদর্শিকভাবে একে মুকাবিলা করতে পারে না সেহেতু তারা একটি ভয়াল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এই সংগঠনের কর্মী বাহিনী এবং জনগণের মাঝে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করতে চায়। তদুপরি মিথ্যা প্রচারণার ঝড় তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালায়।

বৈরী শক্তিগুলোর এই চক্রান্তজাল ছিন্ন করেই ইসলামী সংগঠনকে সামনে এগুতে হবে। একে অবশ্যই জনগণের কাছে পৌঁছতে হবে। জনগণ যাতে বিরুদ্ধবাদীদের অপপ্রচারে প্রভাবিত হতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। আর সেই জন্য ব্যাপক গণ-সংযোগ, বিপুল সংখ্যক প্রচার পত্র বিতরণ, পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মোটকথা বৈরী শক্তিগুলোর যাবতীয় অপকৌশল ভণ্ডুল করে দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্তি মুক্ত রেখে জনগণ এবং সংগঠনের মধ্যে একটি দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সংগঠন যদি এটি নিশ্চিত করতে পারে তাহলে বুলন্দ কণ্ঠেই বলা যাবে যে সংগঠন মজবুতির আরেকটি প্রধান শর্ত পূরণ করতে পেরেছে।

— ০ —

অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ কর্তৃক প্রণীত পুস্তক-পুস্তিকা

১। সূরা আশ শূরার ১৩ নাম্বার আয়াতের শিক্ষা।
প্রকাশনায় আহসান পাবলিকেশন।
২। সূরা আল আ'রাফের প্রথম দশ আয়াতের শিক্ষা।
প্রকাশনায় আহসান পাবলিকেশন।
৩। সূরা হামীমুস সাজদার ৩০-৩৩ নাম্বার আয়াতের শিক্ষা।
প্রকাশনায় আহসান পাবলিকেশন।
৪। আল্লাহর পরিচয়।
প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
৫। আল্লাহর পরিচয় ও দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।
প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
৬। আদর্শ মানব মুহাম্মাদ (সা)।
প্রকাশনায় আহসান পাবলিকেশন।
৭। মহানবীর মহান আন্দোলন।
প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
৮। ইসলামের সোনালী যুগ।
প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
৯। দৃষ্টি ও দৃষ্টিকোণ (প্রবন্ধ সংকলন)।
প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
১০। আসহাবে রাসূলের জীবনধারা।
প্রকাশনায় আহসান পাবলিকেশন।
১১। উসমানী খিলাফাতের ইতিকথা।
প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
১২। জামায়াতে ইসলামীর ইতিকথা।
প্রকাশনায় আহসান পাবলিকেশন।
১৩। বাংলাদেশে ইসলামের আগমন।
প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
১৪। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ)।
প্রকাশনায় আহসান পাবলিকেশন।
১৫। ইসলামের দৃষ্টিতে পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য।
প্রকাশনায় আহসান পাবলিকেশন।
১৬। উপমহাদেশের দুইশত বছরের রাজনীতির খণ্ডচিত্র।
প্রকাশনায় আহসান পাবলিকেশন।
১৭। ইসলামী বিপ্লবের স্বাভাবিক পদ্ধতি।
প্রকাশনায় আহসান পাবলিকেশন।
১৮। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি।
প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
১৯। পুরুষ ও মহিলাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র।
প্রকাশনায় আহসান পাবলিকেশন।
২০। বর্তমান সভ্যতার সংকট।
প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
২১। ইসলামী নেতৃত্ব।
প্রকাশনায় আহসান পাবলিকেশন।

২২। সফল জীবনের পরিচয়।
প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
২৩। আল্লাহর দিকে আহ্বান।
প্রকাশনায় আহসান পাবলিকেশন।
২৪। ইসলামী সংগঠন।
প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
২৫। যুগে যুগে ইসলামী জাগরণ।
প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
২৬। ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ।
প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
২৭। পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস (অনুবাদ)
মূল লেখক আবদুল হামিদ সিদ্দিকী।
প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
২৮। কালজয়ী আদর্শ ইসলাম (অনুবাদ)।
মূল লেখক সাইয়েদ কুতুব।
প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
২৯। অনাগত মানব সভ্যতা ও ইসলাম (অনুবাদ)।
মূল লেখক সাইয়েদ কুতুব।
প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
৩০। ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি (অনুবাদ)।
মূল লেখক অধ্যাপক খুরশিদ আহমদ।
প্রকাশনায় ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।
৩১। আদর্শ শিক্ষক ও আদর্শ প্রধান শিক্ষক।
প্রকাশনায় ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।
৩২। অপপ্রচারের মুকাবিলায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)।
প্রকাশনায় আহসান পাবলিকেশন।
৩৩। A Child's English.
প্রকাশনায় ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।
৩৪। English Lessons-Book One.
প্রকাশনায় ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।
৩৫। English Lessons-Book Two.
প্রকাশনায় ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।
৩৬। বাংলা পড়া-১।
প্রকাশনায় ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।
৩৭। বাংলা পড়া-২।
প্রকাশনায় ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।
৩৮। বাংলা পড়া-৩।
প্রকাশনায় ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।
৩৯। বাংলা ব্যাকরণ, প্রবন্ধ রচনা ও পত্র লিখন-১ম ভাগ
প্রকাশনায় ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।
৪০। বাংলা ব্যাকরণ, প্রবন্ধ রচনা ও পত্র লিখন-২য় ভাগ
প্রকাশনায় ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।
৪১। বাংলা ব্যাকরণ, প্রবন্ধ রচনা ও পত্র লিখন-৩য় ভাগ
প্রকাশনায় ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।